ত্রিবেণী।

উপহৃত তা....

তিনটী ক্ষুদ্র উপন্যাস।

শ্রীবঙ্কিমবিহারী দাস

প্রণীত।

NEW BRITANNIA PRESS

CALCUTTA.

1901.

মূল্য ।৵০ ।

CALCUTTA.

Published by Ashutosh Doss,

16, Ekannath Pandit's Street, Bhowanipore,

AND

PRINTED BY HARI CHARAN MANNA AT THE

NEW BRITANNIA PRESS,

78, AMHERST STREET.

বিজ্ঞাপন।

"ত্রিবেণী" প্রকাশিত হইল। ইহাতে যে তিনটী উপন্যাস সন্নিবেশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুইটী নূতন ও অপরটী পুরাতন। পুরাতনটী ইতি-পূর্ব্বে "সাহিত্য-সেবক" নামক মাসিক পত্রে প্রকা-শিত হইয়াছিল।

আমি এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি বলিয়া এক সম্প্র-দায় পাঠকের নিকট কিঞ্চিৎ অসন্তোষোক্তি শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এইস্থলে ইহা বলি-লেই যথেষ্ঠ হইবে যে, আজিকালিকার বাজারে বঙ্গসাহিত্যের পাঠক বড় দুর্লভ। কেন দুর্লভ, তাহার বিচার করিবার স্থান ইহা নহে।

যাহা হউক, যে কারণে আমি এক্ষণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস লইয়া আসরে নামিয়াছি, তাহা উপরে ব্যক্ত করিলাম। মৎপ্রণীত পূর্ব্ব পুস্তক তিন খানি এবং বর্ত্তমান "ত্রিবেণী" কেবল মাত্র পাঠক-সংগ্রহার্থে লিখিত,—অন্য উদ্দেশ্য সাধনার্থে নহে। পাঠকপাঠিকাগণের উপযুক্ত সহানুভূতি পাইলে বারান্তরে আমি প্রকৃত উপন্যাস লইয়া দেখা দিব।

ভবানীপুর
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮।

বশম্বদ
শ্রীবঙ্কিমবিহারী দাস দাসস্য।

প্রথম।

গঙ্গা।

কমলা।

[১]

প্রকাশচন্দ্র যখন দেখিল, সরকারী গেজেটে প্রবেশিকার তালিকায় তাহার নাম সর্ব্ব বিভাগেই অপ্রকাশ, তখন হিমালয়ের একটা বৃহৎ শৃঙ্গ কেমন অযাচিতভাবে খসিয়া পড়িয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় মধ্যে আপন আশ্রয় গ্রহণ করিল। প্রকাশচন্দ্র সমস্ত দিন শিশুর ন্যায় কাঁদাকাটা করিয়া তাহার দুর্ব্বহ যন্ত্রণাভার ঈষৎ লঘু করিতে প্রয়াস পাইল। এই দারুণ দুঃসময়ে তাহার সহপাঠীবর্গ তাহাকে নানাবিধ উৎসাহ প্রদান করিলেও প্রকাশ-চন্দ্রের হৃদয় তাহাতে মুহূর্ত্তের জন্য প্রবোধ মানিল না,—বরং দিন দিন ভূকম্পনে ধরিত্রীহৃদয়বৎ উহা দমিয়া আসিতে লাগিল।

হৃদয় দমিবার কারণও যথেষ্ট বিদ্যমান ছিল। প্রকাশচন্দ্র পরান্নে প্রতিপালিত,—আশ্রয়-দাতার সম্পূর্ণ অনুগ্রহে তাহার ভবিষ্যজীবন নির্ভর করিতেছে। দ্বিতীয় কারণ, আবার পড়িলে

বিদ্যালয়ে 'ফ্রি-ষ্টুডেণ্ট্‌শিপ্‌' (free-studentship) মিলিবে কি না? তৃতীয় কারণ, প্রতিপালক মহাশয়ের বর্ত্তমান ব্যবহার। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কারণও যে বর্ত্তমান না ছিল, এমত নহে।

অতি দূর সম্পর্কীয় মাতুলের নিকট প্রকাশচন্দ্র আশৈশব প্রতিপালিত। মাতুল মহাশয় কলিকাতার কোন হৌসে কর্ম্ম করিতেন,—আয়ও বিলক্ষণ ছিল। আপন সন্তানসন্ততী ছিল না বলিয়া তিনি বহু হীনাবস্থাসম্পন্ন বালকবালিকাকে সযত্নে প্রতিপালন করিতেন। এইরূপ সাহায্যদানে তাঁহার যে হৃদয়ের মহত্ব ছিল না, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। আজিকালিকার সময়ে কুবেরভাণ্ডার হস্তগত করিলেও কয়জন ব্যক্তি দীনদরিদ্রের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিয়া থাকেন?

তবে ইদানীং প্রকাশচন্দ্রের উপর মাতুল মহাশয়ের কেমন একটা অনাদরের ছায়া সন্ধ্যার অন্ধকারের ন্যায় ধীরে ধীরে পতিত হইতেছিল। প্রতিপালকের এইরূপ ভাবান্তর নিরীক্ষণ করিয়া প্রকাশচন্দ্র তাহার তথ্য নির্ণয় করিতে পারিত না। তাই সে পরীক্ষাপূর্ব্বে আপন মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিয়াছিল যে, একবার নিজে পাশ হইতে পারিলে 'প্রাইভেট্‌ টিউসনী' (private-tution) করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে,—তথাপি মাতুলের আর গলগ্রহ হইয়া থাকিবে না।

এ অভিমানের একটা বিশিষ্ট কারণ ছিল। প্রকাশচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে মাতুলের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইলেও সে মাতুলপত্নী ঠাকুরাণীর কণামাত্র স্নেহাকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় নাই। তাহার ন্যায় একজন অনাথযুবক যে, বিনা পরিশ্রমে আত্মীয়ালয়ে রাজপুত্রের মত (অবশ্য মাতুলানীর নিকট) সুখস্বচ্ছন্দতায় প্রতিপালিত

হইবে, ইহা প্রকাশচন্দ্রের জননীসোদরনয়নে বিসদৃশ না হইলেও মাতুলগৃহিণীর নিকট অতীব যন্ত্রণাদায়ক হইয়া পড়িয়াছিল। তাই তিনি করুণাপরবশে তাঁহার কুপোষ্য ননদিনীপুত্রকে সুযোগ পাইলেই 'মিঠা-কড়া' করিয়া, বেশ দুই-চারি কথা শুনাইয়া দিতেন। তাহার পর, গভীর রজনীযোগে সে সকল কাহিনী পুষ্পপল্লবপরিশোভিত হইয়া ঈষৎ 'রসাল' ভাবে তাঁহার ভর্তৃ-সকাশে যে আদৌ উত্থিত হইত না, তাহার সংবাদ প্রকাশের হইয়া কে কহিতে পারে ?

যাহা হউক, পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইলে মাতুলানী দেবী তাঁহার ভাগিনেয়কে 'খোঁটা' নামক একপ্রকার অব্যর্থ মহৌষধ প্রদান করিয়া সংসারবাসিনীর ন্যায় অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। প্রকাশচন্দ্রের দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্য বশতঃ মাতুল মহাশয়ের ব্যবহারও সেই সঙ্গে তীব্র বিষশেল্যসম তাহার দীনবক্ষ বিদ্ধ করিতে লাগিল। নিদারুণ অভিমান বশে ব্যথিত হৃদয়ে প্রকাশচন্দ্র যে কত কি চিন্তা করিতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা এখন কে করিবে ?

[২]

প্রভাত কাল,—গ্রামের প্রান্ত দিয়া পুণ্যতোয়া ভাগিরথী দেবী মধুর কলকলনিনাদে সাগর-সঙ্গমে অগ্রসর হইতেছেন। স্রোত-স্বতী-হৃদয়ে সুখসমীরসন্তাড়িত উর্ম্মীমালাশিখরে বালারুণরশ্মি পতিত হইয়া বিচিত্র কনকচূর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছে,—ধীরসঞ্চালনে কাঁপিতেছে,—প্রবল তরঙ্গাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া সে দীপ্তি ক্ষীণ-বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। উত্তরতট-

প্রদেশে বটাশ্বত্থপাদপশাখায় উপবেশন করিয়া নানাবিধ বিহগ বিহঙ্গীরা সরলের ন্যায় মনের আনন্দে কলস্বরে প্রভাত কীর্ত্তন করিতেছে।

দুই-চারি মুহূর্ত্ত পরে তথায় একটা ঘাটের নিকট একখানা শিবিকা আসিয়া লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই শিবিকা হইতে একটী বালিকা একজন প্রৌঢ়াসমভিব্যাহারে ধীরে ধীরে বহির্গত হইয়া ঘাটে আসিয়া দণ্ডায়মানা হইল। বালিকার সেই অতুল মহিমা-প্রতিভায় প্রকৃতি-সুন্দরীর অশেষ সৌন্দর্য্যে শারদীয় জ্যোৎস্নার ন্যায় অপূর্ব্ব লাবণ্য লাগিল।

জগতে রমণী-সৌন্দর্য্য ত্রিবিধ। প্রথম—উৎকট; দ্বিতীয়—মধুর; তৃতীয়—উভয়ের সংমিশ্রণ। প্রথম শ্রেণীর রূপ তিলোত্তমা-মেনকা-রম্ভোর্ব্বশী-দর্প-খর্ব্ব কারিণী ভামিনীগণে বিরাজমান,—তোমার-আমার হৃদয়ে সে সৌন্দর্য্য অংশুমালীকিরণে জাগরুক হইয়া থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর রূপমহিমা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত,—তাহা পূর্ণিমালাবণ্যময়, স্নিগ্ধশান্তি প্রদায়ক, দেবাঙ্গনার সৌন্দর্য্যের ন্যায় ছায়াময়। যে রূপ হুতাশনদীপ্তিবৎ উদ্দীপ্ত প্রভায় চিরকালের জন্য হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া থাকে, তাহা রূপ নয়,—কেবল অনন্ত জ্বালাময়ী কামনার আকর। আর যে সৌন্দর্য্য সুখস্মৃতির ন্যায় ছায়ায় মিশ্রিত হইয়া নিশিদিন হৃদয়ে জড়িত থাকে, অথচ তাহাতে কামনার লেশমাত্রও উত্থিত হয় না, তাহাই প্রকৃত রূপ—তাহাই বিস্ময়ে দর্শনীয়—তাহাতেই মানবজীবনে অমরতা বিরাজ করে। আমাদের আগন্তুকা বালিকা এই শ্রেণীর সুন্দরী।

যাহা হউক, কিয়ৎক্ষণ পরে নিজ সঙ্গিনীর সহিত বালিকা নদীগর্ব্ভে অবতরণ করিল। আকটি সলিলে নামিয়া সে আপন

ক্ষুদ্র কর-কমল-সঞ্চালনে চতুর্দ্দিকে রহস্যে জল ছিটাইতে লাগিল। তাহার পর প্রৌঢ়ার সহিত নানাবিধ হাস্যপরিহাস করিতে করিতে বালিকা স্নান করিতে লাগিল।

স্নান সমাপনান্তে শ্বেতসুন্দর বহুমূল্য পট্টবস্ত্রে সুসজ্জিতা হইয়া, শিবিকা হইতে পুষ্পবিল্বপত্রপরিশোভিত হৈম পাত্র লইয়া প্রৌঢ়ার সহিত বালিকা নিকটস্থ শিবলিঙ্গের ক্ষুদ্র মন্দিরোদ্দেশে অমরাঙ্গনার ন্যায় অপূর্ব্ব মহিমায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। বাস্তবিক বালিকার সেই সময়ের সেই মূর্ত্তি তখন যে দেখিত, তাহারই মনে মনে হইত যে, কোন স্বর্গবাসিনী দেবকন্যা কৌতূহলে ত্রিদিবাবাস পরিত্যাগ করিয়া মরতে ভ্রমিবার জন্য ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন,—করদেশে তাঁহার বিচিত্র শান্তি-পুষ্প-পাত্র শোভা পাইতেছে। বালিকার সেই অনির্ব্বচনীয় অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া প্রৌঢ়া ভাবিল, কি সুন্দর!

দুই-চারি মুহূর্ত্ত পরে প্রৌঢ়া ও বালিকা মন্দিরসম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তাহারা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভক্তি ভরে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিল। তাহার পর, মূর্ত্তিপদতলে প্রণাম করিয়া উভয়ে বাহিরে আসিল।

প্রৌঢ়া ও বালিকা সবে মাত্র দেবমন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গনে পদার্পণ করিয়াছে, এমত সময়ে অনতিদূরে কিসের একটা গোলমাল উঠিল। বিস্মিতা হইয়া উভয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর, যেদিক হইতে সেই কোলাহল আসিতেছিল, সেই দিকে তাহারা পূর্ণ কুতূহলে ধাবিতা হইল।

পথ মধ্যে যাইতে যাইতে রঙ্গস্বরে প্রৌঢ়া বলিল, "দিদি! একটু আস্তে চল,—তোমার বোধ হয় বর আস্‌ছে।"

"তো'র মাথা!"—ঈষৎ কুপিতা হইয়া বালিকা বলিল, "তো'র মাথা। আবার আমায় ঠাট্টা ক'র্‌লে এক কিলে তো'র দাঁত ভেঙ্গে দিব।"

অপরা নীরব হইয়া রহিল।

যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে তাহারা উভয়ে যাহা দেখিল. তাহাতে তাহাদের চক্ষুঃ স্থির। তখন তাহারা আপনাপন অস্তিত্ব সম্বন্ধেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। সেই স্থলে উপবেশন করিয়া উভয়েই ভাবিল এও কি সম্ভব?

[৩]

প্রশস্ত প্রকোষ্ঠ। প্রকোষ্ঠভিত্তিতে দর্পণালোকমালা শোভা পাইতেছে। মধ্যে মধ্যে দুই একখানি বিচিত্রালেখ্য কক্ষের সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিতেছে। আলোকাধার হইতে লতা-পাতাপ্রসূনচিত্রিত কাচাবরণ ভেদ করিয়া তরলস্নিগ্ধ রশ্মিরাশি রক্তপ্রস্তরগঠিত কক্ষতলে শাণিতহীরকপ্রভায় তরঙ্গের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে। কচিৎ রুদ্ধবাতায়ন ভেদ করিয়া দূরদূরান্তর হইতে পাপিয়ার অব্যক্তমধুর আনন্দগীতি কক্ষমধ্যে আলসে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

গৃহের মধ্যস্থলে বহুমূল্য খট্টাঙ্গ,—তদুপরি তুষারধবল উত্তরীয়-মণ্ডিত প্রশস্ত শয্যা। শয্যার উপর নিমীলিত-নয়ন একজন যুবক শয়ান। নিদ্রার ঘোরে যুবক মধ্যে মধ্যে উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ বকিতেছিল।

যুবার শিয়রে একজন বালিকা,—পদ্মহস্তে বিচিত্র তালবৃন্ত। পার্শ্বদেশে একজন প্রৌঢ়া,—আনন বিষাদগম্ভীর,—শান্ত কাতর-

দৃষ্টি শয়ান যুবকের প্রতি ন্যস্ত। শিয়রোপবিষ্টারও মুখচন্দ্রমাখানি প্রাবৃটজলদাচ্ছন্ন হইয়া মলিন প্রভায় বিরাজ করিতেছিল।

উভয়ের কাহারও মুখে কোন কথা নাই,—চক্ষে তাহারা অমানিশার ন্যায় চতুর্দ্দিক আঁধার দেখিতেছিল। মানসিক দুশ্চিন্তারাশি তাহাদের হৃদয়ে প্রবল হইয়া জীবনের ভবিষ্যগগনে আশঙ্কার তীব্র তড়িল্লেখা ঘন ঘন অঙ্কিত করিতেছিল। তখন উভয়েই ভাবিতেছিল, "এখন কি উপায় ?"

সহসা শয্যাশায়ীর ভাবান্তর উপস্থিত হইল। সর্ব্বশরীরে তাহার একটা বিষম লোহিতাভা মুহূর্ত্ত মধ্যে ফুটিয়া উঠিল। যুবা আপন করযুগলে দৃঢ় মুষ্টি করিয়া উন্মত্তের ন্যায় কর্কশ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "কমলা !"

শিয়রোপবিষ্টা তালবৃন্ত ফেলিয়া দেবীর ন্যায় স্নেহমধুর কণ্ঠে বলিল, "কেন প্রকাশ ?"

প্রকাশচন্দ্র স্বপ্নদৃষ্টের ন্যায় ধড়্ মড়্ করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। সে জ্ঞানশূন্যের ন্যায় ভাবহীন দৃষ্টিতে কমলার প্রতি হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পর বজ্রমুষ্টিতে কমলার প্রকোষ্ঠ ধারণ করিয়া বলিল, "তুমি কে ?"

অন্তরে অন্তরে সন্ত্রস্তা হইয়া, প্রকাশচন্দ্রের লাবণ্যহীন কঠোর মুখপানে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কমলা উত্তর দিল, "আমি কমলা।"

সম্পূর্ণরূপ উত্তেজনার স্বরে প্রকাশচন্দ্র বলিল, "কমলা ? কমলা কে ? তুমি মানুষ না রাক্ষসী ?"

অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম না হইয়া কমলা চুপ করিয়া রহিল।

তখন সবলে বালিকার হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রকাশচন্দ্র পুনর্ব্বার কহিয়া উঠিল, "ওঃ! বুঝেছি! তুমি কমলা,—পিশাচী,—সয়তানী,—মামার কাছে ধ'রে নিয়ে যেতে এসেছ! আমি সে'খানে যা'ব না। জোর ক'র্‌লেও আমায় নিয়ে যেতে পার্‌বে না। কেমন নিয়ে যেতে পার—এই দেখ!"

এই বলিয়া প্রকাশচন্দ্র সিংহের ন্যায় অমিত তেজে শয্যা হইতে লাফাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে কমলা ও প্রৌঢ়া খট্টাঙ্গ হইতে অবতরণ করিয়া তাহাকে ছুটিয়া ধরিতে গেল। তাহাকে ধরিবা মাত্রই প্রকাশচন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া ভগ্নশাখার ন্যায় কমলার কমলচরণতলে পতিত হইল।

বহু কষ্টে বালিকা ও প্রৌঢ়া প্রকাশচন্দ্রকে পুনর্ব্বার শয্যার উপর শয়ন করাইয়া অতি যত্নের সহিত তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। প্রকাশচন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া স্বভাবকোমলা কমলা আপন নয়নজল রুদ্ধ করিতে পারিল না। বালিকাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া প্রৌঢ়া আশ্বাস দিয়া বলিতে লাগিল, "কাঁদ্‌ছ কেন দিদি? প্রকাশ বাবু শীঘ্রই সেরে উঠ্‌বেন। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?"

[৪]

একে আজন্মদুঃখী, তাহাতে আবার অশিক্ষিত,—প্রকাশচন্দ্র সহসা কোন পথ স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। সে আপনার মানশক্ষে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিতে পাইল,—সম্মুখে অনিশ্চিতের বিশাল বিরাট সমুদ্র,—পশ্চাতে আশ্রয়ভূমির প্রবলভীষণ ঘৃণানল:—সম্মুখে ক্ষীণ আশার নিয়ামক নক্ষত্রের ন্যায় ক্ষুদ্র জ্যোতিঃ,—পশ্চাতে মাতুলগৃহের অমানিশাসমুদ্ভূত জীবনাবনাশী অন্ধকার।

এই আলোক ও আঁধারের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রকাশচন্দ্র পথভ্রষ্টের ন্যায় অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

কিন্তু অকূল-পাথার দেখিলেও প্রকাশচন্দ্র আপন প্রতিজ্ঞা ভুলিল না। সে কেবল এখন মাতুলালয় পরিত্যাগ করিবার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল। মাতুলের অনাদর ও ততোধিক মাতুলগৃহিণীর পৈশাচিক দুর্ব্ব্যবহার প্রকাশচন্দ্রের হৃদয়ে বর্ষা-পাতের ন্যায় বিষম যন্ত্রণাদায়ক হইয়া পড়িয়াছিল।

যাহা হউক, সুযোগের জন্য প্রকাশচন্দ্রকে আর অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হইল না। তাহার সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য বশতঃ একদিন এইরূপ এক ঘটনা ঘটিল, যাহাতে সে সেই দিবসই মাতুলগৃহ পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ মনে করিল। সেইদিন প্রকাশ-চন্দ্রের আবার ভয়ঙ্কর জ্বর।

গভীর রজনী,—তাহাতে অমাবস্যা। প্রকৃতি-সুন্দরী মোহিনীর মোহন বেশ পরিত্যাগ করিয়া করালিনীর ন্যায় আঁধারবেশ ধারণ করিয়াছেন। উপরে অনন্ত গগনহৃদয়ে অনন্ত নক্ষত্রমণ্ডলী,—ক্ষুদ্রপ্রাণা নববিরহক্লিষ্টার ন্যায়,—ক্ষীণ দীপ্তি মানবহৃদয়ে অধিক-তর ভীতির সঞ্চার করিতেছে। জীবনবিহীনার ন্যায় দিগ্বধূ নীরব নিস্তব্ধা।

ঠিক এমত সময়ে প্রকাশচন্দ্র দেউড়ী খুলিয়া তস্করের ন্যায় নিঃশব্দ-গতিতে রাজপথে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। সরণীর উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে শেষ মুহূর্ত্তের জন্য একবার সেই শৈশবপরিচিত আনন্দনিকেতনতুল্য সম্মুখস্থিত সৌধপানে করুণ দৃষ্টিপাত করিল। সেই সময় একবিন্দু তপ্ত অশ্রুজল তাহার কালিমাময় নয়নকোণে শিশিরের ন্যায় দুলিতে লাগিল।

প্রকাশচন্দ্র ভাবিল, তাহার মত হতভাগ্য জগতে আর কয়জন আছে? অনন্ত শৈশবস্মৃতিবিজড়িত মাতুলালয়,—জীবনের জ্ঞানা-লোক হইতেই কত হাসি-কান্না এ গৃহের প্রতি ধূলিতে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে,—প্রকাশচন্দ্র আজ বড় কষ্টেই তাহা চিরজন্মের মত পরিত্যাগ করিতেছে। জীবনের বর্ত্তমান ঘাত-প্রতিঘাতে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিল।

দুই-চারি মুহূর্ত্ত রাজপথে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রকাশচন্দ্র অবশেষে কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের ন্যায় ছুটিয়া চলিতে লাগিল। তাহার নাড়ীতে তখনও জ্বর রহিয়াছে,—ঘোর উত্তাপে গাত্র দিয়া আগুনের ভাপ উঠিতেছে,—প্রকাশচন্দ্র একবার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিল না। সে সেই জ্বরগায়েই লক্ষ্যহীন পথে উন্মত্তের ন্যায় উদ্দাম গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন তাহার মনে হইতে লাগিল, এ দিন কি কখনও ফিরিবে না?

তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে, পাঠকপাঠিকাগণ পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ-যুগলেই তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন।

[৫]

দুই মাসের পর প্রকাশচন্দ্র সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। বালিকা কমলার অশেষ স্নেহ-যত্ন দেখিয়া সে অতিশয় বিস্মিত হইত,—রমণী-হৃদয়ে মন্দাকিনী ধারার ন্যায় এইরূপ সুধাস্রোত অবিরত বহিতে পারে, ইহা তাহার আদৌ বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু সে বিষম ভ্রম এক্ষণে তাহার সঙ্কীর্ণ হৃদয় হইতে ঊষাসমাগমে রজনীর ঘোর অন্ধকারের ন্যায় ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতে লাগিল।

নূতনালয়ে অবস্থান করিতে করিতে প্রকাশচন্দ্র চিন্তা করিল, এখন তাহার কি করা কর্ত্তব্য? সে তাহার অবশিষ্ট জীবন অলসের ন্যায় বিনা কার্য্যে কমলাশ্রয়ে কাটাইবে, না অনন্তপ্রশস্ত সুমহান জলধিতুল্য কর্ম্মস্রোতে আপন অপূর্ণ জীবনটীকে ক্ষুদ্র ভেলাবৎ ভাসাইয়া দিবে? সে বিস্তর তর্কবিতর্কের পর দ্বিতীয় পন্থাই শ্রেয়ঃ মনে করিল,—মৃতের ন্যায় অবস্থান না করিয়া প্রকৃত মনুষ্যের মত সংগ্রামের কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল।

কিন্তু প্রথমেই বিষম অন্তরায়,—অবস্থার উন্নতি কিরূপে হইবে? প্রকাশচন্দ্র কপর্দ্দকশূন্য দরিদ্র,—বুঝি যাহারা মোট বয়, তাহাদের অবস্থাও তাহাপেক্ষা শতাংশে উৎকৃষ্ট। তদুপরি সে মূর্খ না হইলেও বিদ্বান নহে, সুতরাং অবস্থা ফিরে কিরূপে? আবার পরের চাকুরীর উপর আশৈশব তাহার কেমন একটা বিতৃষ্ণা ছিল,—শিক্ষিত হইলেও যে প্রকাশচন্দ্র তদ্দ্বারা কিছু করিতে পারিত, তাহাতে ঘোর সন্দেহ।

এক্ষণে উপায় কি? প্রকাশচন্দ্র তবে কি করিবে? যে ব্যবসায়ে তাহার আন্তরিক অভিলাষ, তাহার মূলধন সে কোথায় পাইবে?

সহসা প্রকাশচন্দ্র কিছুই স্থির করিতে পারিল না। অহরহঃ সে কেবল আপনার মনে অর্থসংগ্রহের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। একটা দারুণ দুশ্চিন্তার ছায়া তাহার প্রশান্ত বদনমণ্ডলে নিবিড় মেঘমণ্ডলের ন্যায় অনুক্ষণ বিরাজ করিতে লাগিল।

একদিন গভীর রজনীযোগে আপন শয়নমন্দিরের বাতায়নপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া প্রকাশচন্দ্র কি চিন্তা করিতেছিল।

সম্মুখে তাহার অনন্ত প্রশান্ত অন্তরীক্ষ,—শুভ্রবক্ষঃ নক্ষত্রখচিত,—যেন রেশমীপটে হীরার ফুল শোভা পাইতেছে। গগনমধ্যে পূর্ণিমার শারদীয় শশধর,—অতুল লাবণ্যে অপূর্ব্ব লাবণ্য মিশিয়া জগতের বক্ষে অমরতাছায়া বিক্ষিপ্ত করিতেছে। অদূরে পাপিয়ার মধুরমূর্চ্ছনা প্রকৃতিস্বরের সহিত সুর মিলাইয়া শ্রুতিমূলে অমিয় ঢালিয়া দিতেছে। একাগ্র-মানসে চিন্তাপ্রযুক্ত এই সকল সৌন্দর্য্যের সহিত প্রকাশচন্দ্রের কোন সহানুভূতি প্রকাশ পাইতেছিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, কি ভাবিয়া প্রকাশচন্দ্র একবার বাহিরে আসিল। দেখিল, সম্মুখে কমলা,—মুখে তাহার দেবীর আনন্দহাস্যরাশি জ্যোৎস্নার ন্যায় ফুটিয়া পড়িতেছে। প্রকাশচন্দ্র সবিস্ময়ে কহিল, "কমলা! এত রাত্রে এখানে কেন?"

বালিকা নিরুত্তর।

পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিস্মিত হইয়া প্রকাশচন্দ্র আবার বলিল, "এখানে এসে কি করছিলে?"

কমলা কথা কহিল না। কিন্তু তাহার মুখের উপর একটা গোলাপী আভা অরুণ-মহিমায় পতিত হইল। প্রকাশচন্দ্র পুনরপি কহিল, "এখনও শোওনি কেন কমলা?"

এইবার কমলার অধর কাঁপিল। মৃদুস্বরে বালিকা বলিল, "এখনও ঘুম পায়নি ব'লে শুই নি। তুমি যে এখনও জেগে র'য়েছ?"

তখন একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া প্রকাশচন্দ্র বলিল, "একটা ভাবনায়—"

বাক্য শেষ না হইতেই কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার আবার কি ভাবনা?"

"আমার ভাবনা অকূল-পাথার।"

"কেন? তোমার কি হ'য়েছে?"

হৃদয়ের আবেগবশে প্রকাশচন্দ্র কমলাকে কি বলিতে যাইতে-ছিল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তে সে আপনাকে সংযত করিয়া নীরব হইয়া রহিল। বর্দ্ধিত কুতূহলে কমলা বলিল, "চুপ ক'রে রইলে যে?"

"চুপ করিনি। তুমি একটা কাজ ক'র্‌তে পারবে?"

"কি কাজ?"

"আমায় কিছু টাকা ধার দিতে পার্‌বে?"

"কত টাকা?"

"এক হাজার।"

"তা' দিব। কাল সকাল বেলা আমি নিজে দাদাবাবুর কাছে চাইব এখন।"

"কিন্তু—"

"ভয় নেই। আমি তোমার নাম ক'রে চাইব না। আমি নিজের দরকার ব'লে নিব।"

প্রকাশচন্দ্রকে আর একটী মাত্র বাক্য উচ্চারণ করিতে অব-সর না দিয়া কমলা তৎক্ষণাৎ ছায়ার ন্যায় তথা হইতে অন্তর্হিতা হইল। অগত্যা প্রকাশচন্দ্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুনর্ব্বার কক্ষে প্রবেশ করিয়া, দ্বারে অর্গল দিয়া শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া দিল। সে শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, কমলা সত্যসত্যই কি এই পাপ-তাপপ্রপীড়িত নারকীয় সংসারের বক্ষে ক্ষুদ্র মানবী?

[৬]

এই স্থলে পাঠক পাঠিকাগণসকাশে গ্রন্থকারের একটী নিবেদন আছে। বর্ত্তমান বিংশতী শতাব্দীর প্রারম্ভে উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার দেখাসাক্ষাতের পূর্ব্বেই নায়িকার 'ঠিকুজী কুলুজী' আওড়ানই নিয়ম। তাহার পর, তাহাদের মুখ দিয়া অনর্গল প্রেমবক্তৃতা-স্রোত প্রবাহিত করার প্রয়োজন। মধ্যে মধ্যে তুই ফোঁটা বিরহ বা অভিমানের আঁখিজলের 'ফোড়ন্' চাই; সর্ব্বশেষে একটা হত্যাকাণ্ড (তাহা নায়কনায়িকার অথবা পাঠকবর্গের উপর দিয়াই হউক) সাধিত হইলেই 'নভেলের' চূড়ান্ত হয়।

পূর্ব্বেই পাঠকপাঠিকাগণকে সাবধান করিয়া রাখি যে, আমার বর্ত্তমান কাহিনীতে ঐ সকলের কিছুই নাই। আমি ক্ষুদ্র লেখক, —ক্ষুদ্র ভাবেই লেখনী-চালনা করা আমার পদ্ধতি। সুতরাং যাহারা কিঞ্চিৎ বড় গোছের কিছু দেখিতে অভিলাষী, তাঁহারা ইহাতে তাহার কিছুই পাইবেন না।

উপরে যে অত কথা বলিলাম, তাহার কারণ কৈফিয়তের ভয়। আজিকালি লিখিতে বসিলেই নানাজনকে নানাবিধ কৈফিয়ৎ দিতে হয়। প্রথম কৈফিৎ বিদ্যার, দ্বিতীয় বুদ্ধির, তৃতীয় বয়সের,—গ্রন্থবিক্রয়ের কৈফিয়ৎটাও কখন দিতে হইবে কিনা, তাহা সর্ব্বশক্তিমানই বলিতে পারেন। সুতরাং এইরূপ স্থলে পরকে সাবধান করিয়া দেওয়া, এবং তৎসঙ্গে আপনাকেও দায়মুক্ত করা বুদ্ধিমানের কার্য্য।

এই দেখুন, আমরা এখনও কমলার কোন পরিচয়ই দিই নাই। কমলা কাহাদের কন্যা, তাহার বয়স কত, সে কি দিয়া বাটীতে

ভাত খায় ইত্যাদি ইত্যাদি বহু বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের একটীও বলি নাই। সুতরাং এইরূপ স্থলে অনেকের রাগ না হওয়াই বিচিত্র। তাই স্বক্ষুদ্র শক্তির দোষ-প্রক্ষালনার্থ উপরের ঐ কৈফিয়ৎটা দিলাম।

কমলা শৈশবেই পিতৃমাতৃহীনা,—এক মাতামহ ভিন্ন তাহার আপনার বলিবার জগতে আর কেহ নাই। কোন বিষয়ে পাছে বালিকার কোন কষ্ট হয়, এই ভয়ে তিনি মাতৃক্রোড়রক্ষিত বিহঙ্গমশাবকের ন্যায় তাহাকে অশেষ যত্নসহকারে লালনপালন করিতেছেন। বালিকাও মাতামহের অতুল স্নেহযত্নে নীরস-পাদপাশ্রিতা ললিতা মাধবী-লতার ন্যায় সরল সৌন্দর্য্যভরে পরিবর্দ্ধিতা হইতেছিল।

তবু বালিকা সুযোগ সত্ত্বেও আপনার পরকাল নষ্ট করে নাই। মাতামহগৃহের যত্নাদর তাহার নিসর্গসঞ্জাত গুণবিকাশের পক্ষে ছায়ার ন্যায় কার্য্য করিতেছিল। বনবালার বিচ্ছুরিত সরলতা, অমরাঙ্গনার সার্ব্বজনীন সহানুভূতি, মহামহিমাময়ীর মধুর মহা-মায়ারাশি সুন্দর মলয়াপরশে ললিত লতিকার ললাম কুসুম-স্তবকবৎ তাহার পবিত্র জীবনের অলঙ্কারস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। কমলা এক্ষণে ত্রয়োদশবর্ষীয়া অনূঢ়া বালিকা।

প্রকাশচন্দ্রের পিতার সহিত কমলার পিতার অতিশয় বন্ধুত্ব ছিল। কমলা ও প্রকাশচন্দ্র সেই জন্যই বাল্যকাল হইতে পরস্পর পরস্পরের পরিচয়সূত্রে গ্রথিত,—বাল্য স্নেহভালবাসাও যে উভয়ের মধ্যে কাহারও ছিল না, এইরূপ বিবেচনা করা সম্পূর্ণ ভ্রম তবে দম্পতীর যেরূপ অনন্ত প্রণয়বন্ধন, তাহাদের শৈশব-সখ্যসূত্র তাদৃশ ছিল না।

পিতার মৃত্যুর পরও প্রকাশচন্দ্র কয়েকবার কমলাদের বাটীতে গিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেকবারেই তাহার অদৃষ্টদোষে তথায় অধিক দিন অবস্থিতি ঘটিয়া উঠিত না। তবে যে কয়দিন সে সেখানে অবস্থান করিত, সে কয়দিনই তথায় বিহার করা তাহার পক্ষে স্বর্গবাসের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। তাই সে দিন মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশচন্দ্র এই আশ্রয়ে আসিবার জন্য উন্মত্তের ন্যায় অত ব্যাকুল ভাবে জ্বরগায়ে ছুটিয়াছিল,—দুর্ব্বলতায় ও মানসিক উত্তেজনায় পথমধ্যে ঐরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

[৭]

কলিকাতায় আসিয়া প্রকাশচন্দ্র কমলাপ্রদত্ত অর্থে ব্যবসা আরম্ভ করিল। সে তাদৃশ শিক্ষিত না হইলেও ব্যবসায়ে তাহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল,—স্বল্পলাভে সে সুন্দর জিনিষ দিয়া সকল ক্রেতারই মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দুই-চারি মাসের মধ্যেই প্রকাশচন্দ্র বাজারে খুব পশার করিয়া ফেলিল।

একদিন প্রকাশচন্দ্র আপনার দোকানে বসিয়া আছে, এমত সময়ে একখানা প্রকাণ্ড চিঠি আসিয়া তাহার হস্তগত হইল। পত্রখানি আর কিছুই নয়,—কেবল 'লটারি' বা ভাগ্যপরীক্ষার বিজ্ঞাপন। প্রকাশচন্দ্র সেই বিজ্ঞাপনে দেখিতে পাইল, 'লটারি' তিন প্রকারের রহিয়াছে,—১০৲।৫৲।২॥০ টাকার টিকিটে বিভক্ত। জয়লাভ করিতে পারিলে শ্রেণী-হিসাবে ১,০০,০০০।৫০,০০০। ২৫,০০০ টাকা একেবারে একসঙ্গে পাইবে।

বিজ্ঞাপন দেখিয়া প্রকাশচন্দ্রের শরীরের রক্ত একটু গরম হইল,—তাহার কি একবার ভাগ্যপরীক্ষা করা উচিত নয়?

'লটারী' প্রভৃতি পৈশাচিক ক্রীড়ার উপর তাহার বিতৃষ্ণা থাকিলেও এ ক্ষেত্রে সে কেমন মূর্খের ন্যায় ভ্যাবাচাকা মারিয়া গেল, —মনটা বড়ই 'দহলা-নহলা' করিতে লাগিল। দরিদ্রতার জ্বালা যখন তাহার মনে উদিত হইল, সে তখন তাহার চিত্ত সংযত করিতে পারিল না,—ভবিষ্য সুখের আশায় সে একখানা টিকিট ক্রয় করিবার সংকল্প করিল।

প্রকাশচন্দ্র তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিল। তাহার সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যবশতঃ সেইবার সে সেই খেলায় জয়লাভ করিল। একত্রে পঁচিশ সহস্র মুদ্রা দেখিয়া তাহার মনে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের যে একটা তুমুল বাত্যা বহিয়া গেল, তাহার কোন ইয়ত্তাই হয় না।

পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রা লাভ করিয়া প্রকাশচন্দ্র একখানা প্রকাণ্ড সৌধ ভাড়া লইল। তাহার পর, সে গৃহ সাজাইতে তাহার যে কিছু খরচ না হইয়াছিল, এমত নহে। তদুপরি অশ্বশকটাদি ক্রয় করিতে তাহার আরও কিছু ব্যয় হইল। হঠাৎ বড় মানুষ হইয়া প্রকাশচন্দ্র দেখিল যে, তাহার তহবিলে আর পঞ্চদশ সহস্র মাত্র মুদ্রা অবশিষ্ট আছে।

যাহা হউক, দিন দেখিয়া প্রকাশচন্দ্র নূতন বাটীতে প্রবেশ করিল। জীবনে তাহার স্বোপার্জ্জিত অর্থে এই প্রথম সুখ। বাটীতে প্রবেশ করিবার সময় প্রকাশচন্দ্র একবার তাহার মাতুল-মাতুলানীর কথা ভাবিয়াছিল কিনা, তাহা অন্তর্য্যামী ব্যতীত আর কে কহিতে পারে?

নবগৃহে প্রবেশ করিয়া প্রকাশচন্দ্র একদিন কমলাকে পত্র লিখিতেছে। পত্র লিখিতে লিখিতে তাহার জ্যোতির্ম্ময় প্রশান্ত

সুন্দর বদনমণ্ডল নবরবিকররঞ্জিত প্রভাতপদ্মের ন্যায় আনন্দ-লেখায় সমুদ্ভাসিত হইতে লাগিল। প্রকাশচন্দ্র লিখিল,—

"কমলা,

তুমি শুনিয়া সুখী হইবে যে, আমার ভাগ্য এক্ষণে প্রসন্ন হইয়াছে। কোন খেলায় আমি একেবারে পঁচিশ সহস্র মুদ্রা পাইয়াছি। তাহাতে আমার অবস্থারও বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। আমি এখন পৃথক বাটী ভাড়া লইয়াছি, এবং বেশ সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছি।

তোমার নিকট যে এক সহস্র মুদ্রা ঋণ লইয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে প্রত্যর্পণ করিতে ইচ্ছা করি। এ বিষয়ে তোমার কি অভিমত, তাহা পত্রে আমায় জানাইও। তোমার অভিলাষ মত তখন কার্য্য করিব।

ইচ্ছা হয়, তোমায় একবার আমার সুখ দেখাই। কিন্তু ইহাতে তুমি মনে করিও না যে, আমি তোমায় অবজ্ঞা করিতেছি। পৃথিবীতে যতদিন জীবিত থাকিব, তোমার ঋণ কখনও শুধিতে পারিব না। কেননা, আমার বর্ত্তমান সকল সুখের মূলই তুমি। তুমি যদি তখন আমার সহায়তা না করিতে তবে বোধ হয় এই জলবুদ্বুদ জীবন কালসমুদ্রবুদ্বুদে কবে মিশিয়া যাইত।

এক্ষণে আমি বেশ ভাল আছি। তোমার ও দাদা মহাশয়ের কুশল সংবাদ দিয়া সুখী করিও। ইতি,

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী

প্রকাশ।"

পক্ষ পরে প্রকাশচন্দ্র তাহার পত্রের উত্তর পাইল। প্রথমেই কমলার সুন্দর হস্তাক্ষরে আপনার শিরোনামা দেখিয়া তাহার

হৃদয়ে যুগপৎ আবেগ ও আনন্দের একটা যে ছায়া ফুটিয়া উঠিল, তাহার নিদর্শন তথনকার বাহ্যভাবেই সহস্র ধারায় উছলিয়া পড়িতে লাগিল। কম্পিতহস্তে পত্র খুলিয়া প্রকাশচন্দ্র পড়িল,—

"শ্রীচরণেষু—

তোমার পত্র আমি যথাসময়ে প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি খেলায় অর্থলাভ করিয়াছ বলিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। কেননা, তোমার লাভে অন্য যে কতজনের চিরসর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে, তাহা বিধাতা ভিন্ন আর কে কহিতে পারে?

মৎপ্রদত্ত যে সহস্র মুদ্রা,—তুমি যাহা এক্ষণে আমায় প্রত্যর্পণ করিতে অভিলাষী,—তাহা অনাথাদিগকে দান করিও। তাহা হইলেই আমার সকল ঋণ পরিশোধ হইবে। আমি বালিকা,—অত অর্থ লইয়া কি করিব?

তোমার ন্যায় আমিও শৈশব অবধি অনাথা, সুতরাং তোমার উপর যে আমার স্নেহ পতিত হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? আমাদের মতন দগ্ধাদৃষ্টজনের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি না থাকাই বিস্ময়ের বিষয়। সংসারে এক মাতামহ ভিন্ন আমার আর কেহই নাই। তাই তোমায় অতীব আপনার বলিয়া জ্ঞান করি। এতদ্ভিন্ন তোমার এমন কোন উপকার করি নাই, যাহাতে তুমি আমায় অমন মিনতির ভাবে পত্র লিখিতে পার। আমার প্রতি তোমার ধারণা দেখিয়া আমি অতিশয় লজ্জিতা।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, তুমি অতি সাবধানে থাকিও। ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য কখনও আপনার নির্ম্মল চিত্ত কলুষিত বা বৃথা ব্যয়ে অর্থ নষ্ট করিও না। তোমার মূলধন অতি সামান্য,—চক্ষুর পলক ফেলিতে না ফেলিতেই মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইয়া

যায়। তবে তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আমি অভিলাষ করি না।

তোমার মঙ্গল সমাচার দিয়া সুখী করিও। উপস্থিত এখানকার একপ্রকার মঙ্গল। ইতি,

তোমার কমলা।"

লিপি পাঠ করিয়া প্রকাশচন্দ্র মনে মনে বড় হাসিল। কমলা বালিকা,—পরিশেষে তাই অমন লিখিয়াছে। অর্থোপার্জ্জন সম্বন্ধে তাহার স্ত্রীবুদ্ধিতে কত কৌশলের কথা আর মনে পড়িবে?

[৮]

দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর মধ্যে প্রকাশচন্দ্র প্রকৃত বড় মানুষ হইয়া উঠিল। প্রায় লক্ষ টাকার কারকারবার,—সে স্বয়ংই সমস্ত তত্ত্বাবধান করে,—ভাগ্যলক্ষ্মীও তাহার প্রতি সুপ্রসন্না,—প্রকাশচন্দ্র যে অর্থশালী হইবে, বিচিত্র কি? ধনবান হইয়া প্রকাশচন্দ্র ঘর-বাড়ী করিল, গাড়ী-ঘোড়া করিল, আরও যে কত কি করিল, তাহার সংবাদ পরশ্রীকাতর ভিন্ন আর কে রাখে?

অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া প্রকাশচন্দ্র ভাবিল, এই সময় একবার যদি মাতুল-মাতুলানী আসিয়া তাহার সেই সুখ-সম্পদ-সম্ভোগ স্বচক্ষে দেখিয়া যান! যে মাতুলপত্নী ইতিপূর্ব্বে তাহাকে অস্পৃশ্য শারমেয়তুল্য মনে করিতেন, তিনি এখন তাহার একটা সহাস্য বচনে আপনাকে তাঁহার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের সহিত সবিশেষ সৌভাগ্যবতী বলিয়া বিবেচনা করেন কিনা, ইহা জানিবার জন্য প্রকাশচন্দ্রের সাভিমান হৃদয় মধ্যে মধ্যে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিত। প্রকাশচন্দ্র সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও মাতুলগৃহিণীর দুর্ব্ব্যবহার এ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে পারে নাই।

কিন্তু ধনবান হইলেও প্রকাশচন্দ্রের মনুষ্যত্ব ছিল। সে যখন আপনার বর্ত্তমান সুখসমৃদ্ধির কথা চিন্তা করিত, তখন তাহার নিসর্গসুন্দর সরল হৃদয়পটে একখানি ত্রিদিবলাবণ্যপূর্ণ রুচি মুখ বিচিত্র অরুণ-মহিমায় জাগিয়া উঠিত,—প্রীতির কনকপুষ্পাঞ্জলি দিয়া সে একান্ত ভক্তের ন্যায় সেই মূর্ত্তির পূজা করিত। সেই সময় সেই মহৈশ্বর্য্যশালিনীকে অঙ্কগত করিবার অভিলাষ তাহার অপূর্ণ বাসনামন্দিরে একটীও যে সুন্দর সুবর্ণ দেউটী জ্বালাইয়া না দিত, এমত বলিতে গেলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

যাহা হউক, প্রকাশচন্দ্রকে এইস্থলে পরিত্যাগ করিয়া আমরা একবার কমলার সংবাদ লইব।

* * *

* * *

সুন্দর সুসজ্জিত সুরুচিসম্মত প্রকোষ্ঠ। প্রকোষ্ঠের চারি-ভিত্তিতে রামায়ণমহাভারত প্রভৃতির অপূর্ব্ব-দৃশ্য-সম্বলিত আলেখ্য-নিচয় শোভা পাইতেছে। রজত-প্রদীপের মৃদু স্নিগ্ধালোকরশ্মিতে কক্ষটী ইন্দ্রবিলাসভবনবৎ হাস্য করিতেছে।

কক্ষের মধ্যস্থলে অমলধবল নলিনীকোমল শয্যার উপর এক-জন বৃদ্ধ শায়িত। বৃদ্ধের দক্ষিণ পার্শ্বে একজন রমণী, বামে একজন প্রৌঢ়। প্রমদার নীলোৎপলতুল্য নয়নযুগল দিয়া অশ্রুজল প্রবাহিনীর ন্যায় শয্যার উপর পতিত হইতেছিল।

বৃদ্ধ কমলার পিতামহ,—রমণী আমাদের পরিচিতা কমলা। বামপার্শ্বে যিনি বসিয়াছিলেন, তিনি বৃদ্ধের প্রতিবেশী, বিশ্বস্ত এবং তাঁহার অতীব প্রিয়। সময় অসময়ে তাঁহার নিকট কমলার মাতামহ বিস্তর সাহায্য পাইতেন।

অন্তিম কাল সহসা শরতের মেঘের মত অযাচিতভাবে বৃদ্ধ-সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে এই 'ভবের হাট' ছাড়িয়া কোন অপরিচিত স্থানে অগ্রসর হইতে হইতেছে। নিষ্ঠুর যমরাজের অযাচিত কঠিন আহ্বানে আপনাকে স্বজনবিহীনা হইতে দেখিয়া কমলা পথহারার ন্যায় দুরন্ত বেদনায় ক্রন্দন করিতেছিল।

একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ অতি কষ্টে কহিলেন, "কমলা!—দিদি! আমি চ'ল্লুম্। তুমি অনাথা,—পাছে তোমার কোন কষ্ট হয়, এই ভয়ে এতদিন তোমায় নিজের মেয়ের মত ক'রে রেখেছি। বড় সাধ ছিল, ভাল বরে তোমার বে দিয়ে আমি শেষজীবন তীর্থে তীর্থে কাটা'ব। কিন্তু বিধাতা আমার সে বাসনা পূর্ণ ক'র্লেন না। তোমায় কা'র কাছে রেখে যা'ব,—অনাথা ব'লে কে আর তোমায় আমার মতন যত্ন কর্‌বে? দিদি! আমার নিজের মেয়ে নেই,—তোমার মুখ দেখেই আমি আমার কন্যাশোক নিবারণ ক'র্‌তুম্। আমার যা' রইল, সবই তোমার। তোমায় আমি ছেড়ে যাচ্ছি ব'লে ভয় পেওনা,—গাঙ্গুলী মশাই তোমায় নিজের মেয়ের মতন দেখ্‌বেন। কমলা!—দিদি! একবার শেষ চুমো দাও।"

বালিকার ন্যায় ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে কমলা তাহার দাদা মহাশয়ের ম্লানজ্যোতিঃ মুখের নিকট আপন মুখচন্দ্রমাখানি লইয়া গেল। চিরজন্মের মত বৃদ্ধ দৌহিত্রীর শেষ চুম্বন লইয়া নিমেষের জন্য একবার নয়ন মুদ্রিত করিলেন। তখন সকলে দেখিল, স্থবিরের পদ্মপলাশলোচনকোণে একবিন্দু আঁখিজল মুক্তার ন্যায় শোভা পাইতেছে।

সেইদিনই শেষ রজনীতে ভগবানের পবিত্র নামোচ্চারণ করিতে করিতে কমলার মাতামহ মহাশয় তুলসী-তলায় সজ্ঞানে অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। দাদা মহাশয়কে ফাকি দিয়া পলাইতে দেখিয়া অনাথা উন্মাদিনীর ন্যায় চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিতা হইল। সকলে তখন ধরাধরি করিয়া তাহাকে সযত্নে গৃহমধ্যে তুলিয়া লইয়া গেল।

[৯]

বাঙ্গালায় একটা প্রবাদ আছে, অধর্ম্মের কড়ি সুদ শুদ্ধ নাস্তিব হইয়া যায়। কথাটা বাস্তবিকই প্রকৃত,—এই বঙ্গদেশে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বিশেষতঃ, কমলা দেবী চঞ্চলা,—সুবর্ণশৃঙ্খলে সবিশেষ আয়াসের সহিত বাঁধিয়া রাখিতে না জানিলে তাঁহাকে চিরহস্তগত করিয়া রাখা অতীব দুষ্কর।

আমাদের প্রকাচন্দ্রেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। সে চঞ্চলাকে কেমন করিয়া প্রসন্না রাখিতে হয়, তাহা জানিত না,—তাই তাহার অদৃষ্টে অধঃপাতের সূত্রপাত হইয়াছিল। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম করিয়া প্রকাশচন্দ্র যখন বিস্তর সম্পত্তি করিয়া ফেলিল, ব্যবসার প্রতি তখন তাহার তত মনোযোগ রহিল না। কর্ম্মচারী প্রভৃতি লোকজনের উপর কারবারের সকল কার্য্য নির্ভর করিয়া প্রকাশচন্দ্র কেবল বিলাসিতা, জুয়াখেলা, ও আমোদ-প্রমোদে মূর্খের ন্যায় অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

নববর্ষপ্রারম্ভে প্রকাশচন্দ্র দেখিল, বাজারে তাহার প্রায় দুই লক্ষ টাকা দেনা হইয়াছে। এক বৎসরের মধ্যে কিসে তাহার এত মুদ্রা ঋণ হইল, তাহার কারণ প্রথমে সে বুঝিতে পারিল না। তাহার পর কর্ম্মচারীরা যখন খাতা খুলিয়া তাহাকে সমস্ত হিসাব

দেখাইল, তখন সে তাহার ঋণসম্বন্ধে আদৌ অবিশ্বাস করিতে সক্ষম হইল না। তবে সে হিসাব মধ্যে যে কিছুই গোলমাল ছিল না, এমত নহে।

প্রকাশচন্দ্র ভাবিল, হায়! সে কি করিয়াছে! এ সকল কথা কমলা শুনিলে সে কি মনে করিবে!. প্রকাশচন্দ্র কি আর কখনও তাহার উন্নতিবিধায়িনী হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর স্নেহাকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবে?

ভাবিয়া ভাবিয়া প্রকাশচন্দ্র উন্মত্তের ন্যায় হৃদয়ের শান্তি হারাইল। সে তখন জীবনের সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিবার জন্য সুরা-দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিল। ওদিকে জুয়াখেলাও পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল।

পাপের প্রবাহে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশচন্দ্র যখন পিশাচের ন্যায় অঙ্গ ঢালিয়া দিল, তখন কমলার নামোচ্চারণ করিতেও তাহার হৃদয় দুরু-দুরু কাঁপিয়া উঠিত। তখন সেই নাম প্রকাশচন্দ্রের স্মৃতিপথে উদিত হইলেই সে তুষানলদগ্ধ দুর্ভাগার ন্যায় কোটি কোটি নারকীয় যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিত,—পাপজীবন কঠিন বন্ধন বিদীর্ণ করিয়া অনন্তে মিশিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িত। তাই বিস্মৃতিসলিলে পুণ্যস্মৃতি বিসর্জ্জন দিবার জন্য প্রকাশচন্দ্র অষ্টপ্রহর ষোড়শোপচারে সুরাদেবীর অর্চ্চনা করিত,—রক্তাভাপ্রকাশিনী ডিকাণ্টারসুন্দরী পতিব্রতা সতীর ন্যায় কদাচ তাহার সঙ্গছাড়া হইত না।

উপযুক্ত তত্ত্বাবধান অভাবে প্রকাশচন্দ্রের কারকারবারও বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। কর্ম্মচারিগণ কেবলমাত্র বেতনভুক্, প্রভুর ইষ্টের প্রতি আদৌ তাহাদের আগ্রহ ছিল না। বরং

মুনিবের অনিষ্টেই তাহাদের 'পোয়াবার',—যে যাহা পারিল সে তাহাই লইয়া একে একে অন্তর্ধান হইতে লাগিল। প্রকাশচন্দ্রের দৃষ্টিও আদৌ এই দিকে ছিল না।

এইরূপে প্রকাশচন্দ্রের দিন দিন অধোগতি হইতে লাগিল। এইরূপে সে লক্ষ্মীকে স্বপ্রতিভায় হস্তগত করিয়াও আপনার সামান্য দুর্ব্বলতায় তাঁহাকে পায়ে ঠেলিতে লাগিল। এইরূপে নিজ মূর্খতায় প্রকাশচন্দ্র দিনে দিনে পুনর্মূষিক হইতে লাগিল।

[১০]

কমলা দেখিল, প্রায় বৎসরাবধি প্রকাশচন্দ্রের কোন পত্র আসিতেছে না। তাহার ব্যবহারে সে অতিশয় বিস্মিতা হইল,—ধনশালী হইয়া প্রকাশচন্দ্র কি তাহাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে? যাহাকে সে আপনার অধিক বলিয়া জানে,—যাহার চিরোজ্জ্বল সুন্দর মূর্ত্তি কল্পনায় মনের মত গড়িয়া লইয়া একান্তা ভক্তার ন্যায় সে হৃদয়ের স্নেহ-প্রীতি-অনুরাগ-সর্ব্বস্ব দিয়া প্রতিদিন অর্চ্চনা করে,—যেও তাহাকে পাইলে আপন নিষ্ফলবাসনাময় দুর্ভাগ্য-জীবন এক সময় সার্থক বলিয়া বিবেচনা করিত, সে কি আজ বিনা কারণে তাহাকে বিস্মৃত হইবে,—সে কি এমন নিষ্ঠুরের ন্যায় কার্য্য করিবে?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কমলা প্রকাশচন্দ্রকে একখানি পত্র লিখিল। পত্র লিখিয়া সে স্থির করিল, ইহার কোন উত্তর না পাইলে সে স্বয়ং কলিকাতায় যাইবে। কমলার ভবিষ্য জীবনের বহু বাসনা প্রকাশচন্দ্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছিল।

প্রায় এক মাস পরে কমলার সে লিপির উত্তর আসিল। পত্রখানি ত্বরিতহস্তে লেখা,—সকল বাক্যই অর্থহীন,—বহু আয়াস

সহকারে সে পত্রের ভাব সংগ্রহ করিতে হয়। কমলা কারণ বুঝিতে সক্ষম হইল না।

সেইদিনই কমলা আবার প্রকাশচন্দ্রকে একখানি পত্র লিখিল। তাহাতে সে অনেক মিনতি করিয়া লিখিল যে, এইবার যেন প্রকাশচন্দ্র স্পষ্ট করিয়া তাহাকে সকল কথা খুলিয়া লিখে। বড়মানুষ হইয়া প্রকাশচন্দ্র যে, তাহাকে একেবারে ভুলিয়া যাইবে, কখনও সে এইরূপ আশা করে নাই। ইত্যাদি ইত্যাদি। অনাথা জানিত না, প্রকাশচন্দ্র আপন নরকের পথ স্বহস্তে সাফ্ করিয়া তদ্দিকেই পিশাচের মত নিয়ত ধাবিত হইতেছে।

দুই মাস পরে এই পত্রের উত্তর আসিল। পূর্ব্বলিপির ন্যায় ইহাও অসম্বদ্ধ,—সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও কোন অর্থসঙ্গতি হয় না। তবে চিঠিখানি আদ্যোপান্ত বিষাদস্বরপারপূরিত,—হতাশ্বাস পূর্ণ মাত্রায় ফুটিয়া পড়িতেছে।

কিসের হতাশ ?—কমলা কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তাহার পর তাহার যাহা মনে হইল, তাহা অতীব ভয়ঙ্কর,—শুদ্ধ স্মরণ মাত্রেই তাহার চক্ষুঃ ফাটিয়া দর দর ধারায় অশ্রুপ্রবাহ ছুটিল,—সহস্র আয়াস সত্ত্বেও বাঁধ দিয়া প্রহতা প্রবাহিনীর সেই তীব্র গতি রোধ করিতে পারিল না। কমলা ভাবিল, সত্যসত্যই কি প্রকাশচন্দ্র এইরূপ পাষাণ হইবে ?—সত্যসত্যই কি তাহাকে ভিখারিণীর ন্যায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে ?—সত্যসত্যই কি সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার জীবনযজ্ঞ সমাপ্ত করিবে ?

তবে প্রকৃত রহস্য কি ? অত মিনতি করিয়া পত্র লিখিলেও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশচন্দ্র কিছু ব্যক্ত করে না কেন ? তবে কি সে তাহার উপর রাগ করিয়াছে ?

কিন্তু রাগ কিসের? জ্ঞানতঃ ও অজ্ঞানতঃ কমলা ত প্রকাশচন্দ্রের কোন অনিষ্ট করে নাই! তবে তাহার উপর প্রকাশচন্দ্রের ক্রোধ কেন?

কেন?—কমলা কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাই সে অভিমান করিয়া কঠিন ভাষায় প্রকাশচন্দ্রকে পুনরায় একখানি পত্র লিখিল। লিপি প্রেরণ করিয়া কমলা আশা করিল, প্রকাশচন্দ্র এইবার নিশ্চয়ই সকল কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিবে।

এক মাস, দুই মাস, তিন মাস অতিবাহিত হইল, তথাপি পত্রের কোন উত্তর আসিল না। কমলা তখন অতিশয় চিন্তান্বিতা হইল,—প্রকাশচন্দ্র কি সত্যসত্যই তাহাকে ঘৃণা করে? কমলা ইহা কোন মতে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

তখন নিরুপায় হইয়া কমলা ক্রন্দন করিতে বসিল। বালিকার ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া সে যে কতই কাঁদিল, তাহার আর কি কহিব? ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনাথা আপন আঁখিমুখ ফুলাইয়া ফেলিল।

গভীর রজনী,—একে কৃষ্ণ পক্ষ,—তাহাতে আবার মেঘ করিয়াছে। নিবিড়কৃষ্ণ গগনমণ্ডলে নীরদাচ্ছন্না নক্ষত্রসুন্দরী ধরিত্রীর ভয়ঙ্কর বেশ নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে ভয়ে আঁখি মেলিতেছেন। প্রলয়ের অনন্ত ভীষণতার ন্যায় চতুর্দ্দিক নীরব নিস্তব্ধ।

এমন সময়ে আপন শয়নমন্দিরে বিচিত্র পালঙ্কের উপর শয়ন করিয়া—অভাগিনী কমলা। প্রকোষ্ঠকোণে কুসুমলতাপাতাচিত্রিত উজ্জ্বল রজতাধারে স্বর্ণপ্রদীপ উজ্জ্বল শিখায় জ্বলিতেছে। বিচিত্র মর্ম্মরপ্রস্তররঞ্জিত কক্ষতল দীপরশ্মিপরশে অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নামহিমায় হাস্য করিতেছে।

শয়ানার বদনমণ্ডল বড়ই বিষাদগম্ভীর। প্রকাশচন্দ্রের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া সে খররবিকরপীড়িতা সলিলসিঞ্চনশূন্যা নীরস মাধবিকার ন্যায় দিন দিন ম্লান হইতেছিল। অনাথা জানিত না যে, সে যাহার জন্য উন্মাদিনী, সেই প্রকাশচন্দ্র আজ নরক-কীটেরও অধম হইয়াছে!

"খট্—খট্—খট্!"—বহির্দ্দেশ হইতে দ্বারে কে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি-প্রহার করিল। স্বপ্নাবিষ্টার ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া কমলা কর্ণস্থির করিল। মুহূর্ত্তের ভিতর পুনর্ব্বার সেইরূপ শব্দ শ্রুত হইল। সাহসে ভর করিয়া তখন কমলা বলিল, "কেও?"

কর্কশ কণ্ঠে কে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "আমি।"

স্বর শুনিয়া কমলা আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। কবাট অর্গল-চ্যুত করিতে করিতে সে মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, "প্রকাশ! এত-দিন পরে অভাগিনীকে কি মনে প’ড়েছে?" অশ্রুবাষ্পে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

কিন্তু এ কি? এ যে পিশাচমূর্ত্তি!—কমলা দ্বারোন্মোচন করিয়া প্রকাশচন্দ্রকে দেখিয়া অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিল। ভয়ে মুখ দিয়া তাহার একটীও বাক্য ফুটিল না। কেবল একটী দীর্ঘ নিশ্বাস তাহার নাসিকাপ্রান্ত ছাড়াইয়া অনন্তে মিশিয়া গেল।

প্রকাশচন্দ্র কমলার মুখভাব অবলোকন করিয়া আপন নয়ন-যুগল নত করিল। তাহার পর মধ্যমাঙ্গুলীর নখাগ্র খুঁটিতে খুঁটিতে সে কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিল। পরে ভগ্ন কণ্ঠে কহিল, "কমলা! আজ অনেক রাত্রি হ’য়েছে,—শোও গে।"

এই বলিয়া প্রকাশচন্দ্র আর একটী কক্ষে প্রবেশ করিল। কমলার হৃদয়ের ভাব তখনও কিছুমাত্র কমে নাই। সে কেবল

তথায় দণ্ডায়মানা হইয়া বিমূঢ়ার ন্যায় ফ্যাল্ ফ্যাল্ চাহিয়া থাকিয়া অনবরত ভাবিতে লাগিল, এই কি সেই প্রকাশ ?

[১১]

ঘরে কবাট দিয়া প্রকাশচন্দ্র দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিল। তাহার পর পকেট হইতে বাতি ও দিয়াশলাই বাহির করিয়া আলো জ্বালিল। পরে একটা কাষ্ঠাসন দেখিয়া তাহাতে উপবেশন করিল।

বসিয়া বসিয়া প্রকাশচন্দ্র ভাবিতে লাগিল, পৃথিবী সুখের না দুঃখের ? সে জন্মাবধি দুর্ভাগা,—পরান্নে আশৈশব প্রতিপালিত,—জীবনে লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। তাহার পর তাহার অর্থ হইয়াছিল, ঐশ্বর্য্য হইয়াছিল, সকলই হইয়াছিল,—দণ্ড মাত্র কিন্তু সে একবারও সুখী হইতে পারে নাই। অতীত তাহার যেমন ঘনঘটাচ্ছন্ন,—বর্ত্তমানও তাহাই,—বরং নীরদমণ্ডলী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ঘনীভূত হইয়াছে। তখন হৃদয় প্রভাত-কুসুমের ন্যায় স্বরগপবিত্র ছিল, এখন তাহা নরকের পূতিগন্ধে আমূল জর্জ্জরিত। জীবনের শেষ এই পরিণাম ! প্রকাশচন্দ্র ভাবিল, "জগতে আর এ জীবনের প্রয়োজন ?"

কিছুই নয় !—প্রকাশচন্দ্রের দুর্ব্বহবেদনাপীড়িত অবসন্ন হৃদয় উত্তর দিল, "কিছুই নয় ! সংসারের পক্ষে সে একপ্রকার মৃত।"

তবে এক বিষয়ে প্রকাশচন্দ্রের বড় সাধ হইত। কিন্তু কালের করাল কুটিলাঘাতে তাহাও এখন ছিন্নভিন্ন। কমলা কি কখনও তাহার মত পাপিষ্ঠকে হৃদয়ে আর স্থান দিবে ? প্রকাশচন্দ্র কখনও কি তাহার ক্ষমালাভ করিতে সক্ষম হইবে ?

হতাশ হইয়া প্রকাশচন্দ্র ভাবিল, "না।" কমলা যদি তাহাকে ক্ষমা করিত তাহা হইলে তাহাকে দেখিয়া তাহার মুখ দিয়া কি একটীমাত্রও বাক্য উচ্চারিত হইত না? এতদিনের পর দেখা-সাক্ষাতে কমলার মুখে কি আনন্দচিহ্ন প্রকটিত হইত না?

তবু জীবনে বড় সাধ হয়। প্রকাশচন্দ্র যাহাঁকে ভালবাসে তাহার আশ্রয়ে থাকিতে পাইলে সহস্র যাতনার মধ্যেও তাহার হৃদয় কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করে। কিন্তু কমলা যে তাহাকে ঘৃণা করিবে,—সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধার সহিত তাহার সহিত যে বাক্যালাপ করিবে,—পিশাচের অধম বলিয়া আপনার অবশিষ্ট জীবন যে পথের ভিখারীর ন্যায় অতীব অনাদরের সহিত অতিবাহিত করিতে হইবে! প্রকাশচন্দ্র প্রাণ থাকিতে তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। পরের অনাদর বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু যাহার পবিত্র মূর্ত্তি বিচিত্র অরুণমহিমায় এক সময় জীবন হাসাইয়াছিল,—সে সহস্রবার পর হইলেও,—তাহার অনাদর একান্ত অসহ্য! তাই গত্যন্তর না দেখিয়া প্রকাশচন্দ্র স্থির করিল, সে তাহার মাটীর দেহ মাটীতেই মিশাইবে,—আপনার পাপ-জীবনের অবসান করিয়া ধরিত্রীর ভার কিঞ্চিৎ অপনোদন করিবে।

সংকল্প স্থির করিয়া প্রকাশচন্দ্র প্রকোষ্ঠের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, বিবিধচিত্রাঙ্কিত গৃহভিত্তিতে তাহার করাল ছায়া পতিত হইয়া তাহাকেই নিষ্ঠুরের ন্যায় উপহাস করিতেছে। কি ভাবিয়া প্রকাশচন্দ্র অন্তরে শিহরিয়া উঠিল।

গৃহমধ্যে সেল্‌ফের উপর কি একটা বাক্স ছিল। প্রকাশচন্দ্র বিকারগ্রস্তের ন্যায় তথায় অগ্রসর হইয়া উহা নামাইল। বাক্সের ডালা খুলিয়া সে দেখিতে পাইল, তন্মধ্যে দুই নলা একটা বন্দুক

এবং তদুপযুক্ত 'কার্টরিজ' বা টোটা রহিয়াছে। প্রকাশচন্দ্র তাহা দেখিয়া উন্মত্তের ন্যায় লাফাইয়া উঠিল। সে তখন একবারও ভাবিল না যে, সে কি ভয়ঙ্কর কার্য্যই করিতে যাইতেছে। পাপ-পুণ্যের কথা তখন তাহার নিকট পীড়িতের স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল।

যোড়াতাড়া দিয়া প্রকাশচন্দ্র বন্দুকে টোটা পূরিল। তাহার পর পকেট হইতে এক টুক্‌রা কাগজ লইয়া পেন্সিল্ দিয়া কি লিখিল। লেখা শেষ হইলে পর যথাস্থানে সেইগুলিকে রক্ষা করিয়া সে বন্দুকের মুখে বুক পাতিয়া দিল।

এক মুহূর্ত্তের বিলম্ব,—পরে সকলই শেষ হইয়া যায়। প্রকাশ-চন্দ্র মনে মনে জগতের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিল,—মনে মনে ভগবানের নিকট অন্তিম প্রার্থনা জানাইল,—মনে মনে কমলার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল। কমলার নাম স্মরণ মাত্রেই হতভাগ্যের নয়নকোণে এক বিন্দু অশ্রু ফুটিয়া উঠিল,—প্রবল-বাত্যান্দোলিত মহামহীরুহের ন্যায় তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। সেই কম্পনবেগে স্থানভ্রষ্ট হইয়া আগ্নেয়াস্ত্র কক্ষতলে পতিত হইল,—সঙ্গে সঙ্গে একটা বিষম আওয়াজও হইয়া গেল।

জীবনবিহীনের ন্যায় প্রকাশচন্দ্র পাণ্ডুর, নিথর, নিস্তব্ধ। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া সে পুনর্ব্বার বন্দুক উঠাইল,—জগতের নিকট নিশ্চিতই সে চিরবিদায় গ্রহণ করিবে। কিন্তু তাহার সে সংকল্প আর খাটিল না,—পলকের মধ্যে কপাট ভাঙ্গিয়া, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার হস্ত হইতে কে বন্দুক কাড়িয়া লইল। পরুষকণ্ঠে প্রকাশচন্দ্র তাহাকে বলিল, "আমি তোমার এমন কি ক'রেছি যে, তুমি আমার মরণেও বাধা দিচ্ছ?"

দরদর নেত্রে গৃহপ্রবেষ্টা বলিল, "তুমি ম'র্‌বে কেন ?"

"ম'র্‌ব কেন ? তুমি কি আমায় বেঁচে থাক্‌তে বল ? আমার জীবনে আর লাভ কি ? অনেক আশা ক'রে তোমার কাছে এসেছিলুম, কিন্তু তা'তেও তুমি আমায় নিরাশ ক'রেছ ! তবে আর ঘৃণীত জীবন নিয়ে কি হ'বে কমলা ?"

অশ্রুবিগলিতনয়নে কমলা কহিল, "প্রকাশ ! আমায় ক্ষমা কর। অনেক দিনের পর তোমায় মলিন মুখে মলিন বেশে দেখে আমি কেমন এক রকম হ'য়ে গেছ্‌লুম্‌। তোমার অভ্যর্থনা ক'র্‌তে পারিনি ব'লে আজ আমায় মাফ্‌ কর।"

"তবুও আমায় ম'র্‌তে হ'বে।"

"কেন ম'র্‌বে। তুমি যা'তে সুখী হও আমি তা'ই ক'র্‌ব। প্রকাশ ! তোমার পায়ে পড়ি—"

বাধা দিয়া প্রকাশচন্দ্র স্থির কণ্ঠে কহিল, "শোন কমলা ! কেন ম'র্‌ব। আমি এখন পথের ভিখারী ! মদে, বেশ্যায়, জুয়াখেলায় আমি যথাসর্ব্বস্ব উড়িয়েছি। বাকী কারকারবার,—তা'ও আজ কর্ম্মচারীদের কৃপায় ছয় মাস বন্ধ। তা'র পর, বাজারে আমার প্রায় দু'লাখ্‌ টাকা দেনা,—যা' ছিল সব গেছে,—এখন শোধ্‌বার আর উপায় নেই। দেনার জন্য হয় আমায় জেলে যেতে হ'বে, নয় ত 'ইন্সল্‌ভেণ্ট' হ'তে হ'বে। রাস্তায় দেখ্‌তে পেলেই লোকে আমার গায়ে থুতু দেবে। বল কমলা ! এখন জীবনে আর আমার লাভ কি ?

কথা শুনিয়া কমলা বজ্রাহতার ন্যায় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "দেনা শোধ্‌বার আর কি কোন উপায় নেই ?"

"উপায় ? কৈ ? তা'ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না ! এক উপায় আছে,—মূলধন নিয়ে ফের বসা। কিন্তু টাকা কৈ ?"

"আমি দিব।"

"কে ? কমলা ? তুমি ? আমি পাপিষ্ঠ, ঘৃণীত, কুক্কুরের‍ও অধম,—তুমি আমায় ফের সাহায্য ক'র্‌বে ? যে তোমার অমূল্য উপদেশ হেলায় হারিয়েছে,—যে তোমায় ইদানীং শতবার তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ক'রে এসেছে,—যে আজ বেশ্যার ক্রীতদাস, তা'র তুমি এখনও সহায়তা ক'র্‌বে ? তুমি কি আমায় উপহাস ক'র্‌ছ ?"

"না প্রকাশ। তোমায় উপহাস করিনি। প্রত্যেক মানুষেরই ভুল হয়,—তোমায় তবে দূষ্‌ব কেন ? হৃদয়ে তোমার যে এখন অনুতাপ উঠেছে, তা'তেই তোমার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু—"

"কিন্তু কি কমলা ?"

আগ্রহের সহিত দাঁড়াইয়া উঠিয়া কমলা কহিল, "কিন্তু গা ছুঁয়ে আমার দিব্যি কর।"

"কি দিব্যি ক'র্‌ব কমলা ?"

"দিব্যি কর, আর কখনও ও কাজ ক'র্‌বে না ?"

"না কমলা ! তুমি যদি আমায় স্নেহ কর,—তোমারই মতন অনাথ ব'লে আমার সকল দোষ যদি ভুলে যাও,—তোমায় যদি আমি বুকে রাখ্‌তে পাই তবে, তোমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করছি, আর কখনও কুপথে যা'ব না,—আর কখনও তোমার পরামর্শ ছাড়া কোন কাজেই হাত দিব না। বল কমলা ! তুমি আমায় ঘৃণা ক'র্‌বে না ?"

"না প্রকাশ ! তোমায় আমি ঘৃণা ক'র্‌ব না। এখন মুখ-হাত-পা ধোবে চল,—রাত্রি হ'য়েছে।"

এই বলিয়া কমলা প্রকাশচন্দ্রের হস্তধারণ করিল। সেই কমকোমল করস্পর্শে প্রকাশচন্দ্র নবজীবন লাভ করিল। সে তখন ভাবিল, কমলার ন্যায় দেবীমূর্ত্তি সংসারে আর কয়জন আছে ?

[১২]

কমলার নিকট মূলধন লইয়া প্রকাশচন্দ্র পুনর্ব্বার কার-কারবার খুলিল। বাজারে তাহার যথেষ্ট সুনাম ছিল, সুতরাং দেখিতে দেখিতেই তাহার ব্যবসা পূর্ব্বের মত জাঁকাইয়া উঠিল। বিশ্বাসঘাতক পুরাতন কর্ম্মচারিগণকে বিদায় দিয়া সে তৎস্থানে নূতন লোক নিযুক্ত করিল।

নগরে আসিবার পূর্ব্বে প্রকাশচন্দ্র কমলার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, সমস্ত দেনা পরিশোধ না করিয়া কমলার সে পাণিগ্রহণ করিবে না। সুতরাং সে সহরে আসিয়া এক মনে নিজ ব্যবসায়ে নিযুক্ত রহিল। দেখিতে দেখিতে তিন মাসের ভিতর প্রকাশচন্দ্র বাজারের সকল ঋণ কতক কতক শুধিয়া ফেলিল।

তাহার পর আরও তিন মাস অতিবাহিত হইল। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে সর্ব্বঋণ পরিশোধ করিয়া প্রকাশচন্দ্র আবার বাড়ী কিনিল, গাড়ী করিল,—এমন কি পূর্ব্বৈশ্বর্য্যের কতকটাও ফিরিয়া পাইল। তবে দুষ্টা সরস্বতী-দেবী যে, তাহার স্কন্ধদেশে প্রকাণ্ড জোয়ালের ন্যায় আর অধিষ্ঠান করেন নাই, ইহা বলা বাহুল্যমাত্র।

নূতন বাটী কিনিয়া প্রকাশচন্দ্র কমলাকে একখানি পত্র লিখিল। পত্র লিখিতে লিখিতে সে পাগলের ন্যায় কখন হাসিল, কখন কাঁদিল, কখনও বা আবার স্থির গম্ভীর হইয়া রহিল।

তাহার পর পত্রে কমলার শিরোনামা দিয়া উহা ডাকে পাঠাইয়া দিল।

প্রায় সপ্তাহ পরে পত্রের উত্তর আসিল। কম্পিত হস্তে লিপি খুলিয়া প্রকাশচন্দ্র পাঠ করিল,—

"শ্রীচরণেষু—

তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আপন প্রতিজ্ঞাপালনে সমর্থ হইয়াছ জানিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। এইরূপ সাবধানতার সহিত চিরকাল চলিতে পারিলে জীবনে তুমি কদাচ কষ্ট পাইবে না।

অন্যান্য বিষয়সম্বন্ধে যাহা জানিতে চাহিয়াছ, তাহার সংবাদ গাঙ্গুলী মহাশয়ের নিকট হইতে লইও। কেননা, তিনি আমার বর্ত্তমান অভিভাবক। সুতরাং তাঁহার অমতে আমি কোন কার্য্যই করিতে পারিব না।"

* * *

* * *

গাঙ্গুলী মহাশয়কে প্রকাশচন্দ্র একখানি পত্র লিখিল। যথাসময়ে তাহার উত্তরও আসিল। গাঙ্গুলী মহাশয় লিখিয়াছেন, "আমরা শীঘ্রই কলিকাতায় যাইতেছি।"

সপ্তাহ পরে গাঙ্গুলী মহাশয় সপরিবারে কমলার সহিত রাজধানীতে আগমন করিলেন। প্রকাশচন্দ্র দুইবেলা কমলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত। কমলা কিন্তু সকল সময় তাহাকে দেখা দিত না।

বিবাহমাস আসিলেই দুই বাটীতে বড় ধূম পড়িয়া গেল,— বিহঙ্গমকূজিত অপূর্ব্ব মধুবৃক্ষের ন্যায় দিবারাত্রি তাহা কমকল-

মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া উঠিল। শুভদিন স্থির হইয়া গেলে দুই পক্ষেই নন্দনোৎসব চলিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে সহস্র স্নেহোচ্ছ্বাস-মধ্যে অতি সমারোহের সহিত কমলা ও প্রকাশচন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি,—প্রকাশচন্দ্রের মাতুল মহাশয়ই বরকর্ত্তা সাজিয়াছিলেন, এবং তাঁহার গৃহিণী-দেবী কয় ফোঁটা (আন্তরিক কিনা জানিনা) চক্ষের জল তাঁহার ননদ-নন্দাইয়ের জন্য পাত করিয়াছিলেন। তবে ভাগিনেয়গৃহের চিরাধিপত্য-লাভ তাঁহার যে ঘটে নাই, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

বিবাহের পর প্রকাশচন্দ্র একদিন আপন যুবতী ভার্য্যাকে দৃঢ়ালিঙ্গনবদ্ধা করিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "কমলা! আজ আমাদের কি সুখের দিন! ভগবানের কৃপায় আজ আমি স্বর্গ হাতে পাইয়াছি,—তোমায় কি আর কখনও বিস্মৃত হইব? তুমি বুকে আমার বিরাজ করিলে চঞ্চলা কি আর কখনও আমায় পরিত্যাগ করিবেন?"

এই বলিয়া জীবনের সকল অনুরাগ একত্র করিয়া প্রকাশচন্দ্র কমলাধরে একটী চুম্বন দিল। তাহার পর একটী ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া সে ভাবিতে লাগিল, "এই স্বপ্ন কি আর কখনও ভাঙ্গিবে?"

দ্বিতীয় ।

যমুনা ।

সহপাঠী।

[১]

সহপাঠী!—

পাঠক মনে করিও না যে, আমি 'এক গেলাসের' ইয়ারের কথা বলিতেছি। কালেজে পড়িতে পড়িতে অনেকেই 'ইয়ার' হয় বটে,—এবং তাহাদের দলে মিশিয়া আমরাও যে উহা না হই, এমন নয়,—কিন্তু ও ইয়ারকির সহিত বিলাতীবিচালীবন্ধা বিবিধ-বর্ণপ্রকাশিনী বোতলবাহিনীর কোন নিকট সম্বন্ধ আছে কিনা জানিনা। তবে 'ক্লাসে' ও 'গ্লাসে' অন্য কোনরূপ ঘনিষ্টতার বিষয় আমি অনবগত,—সুতরাং ঐ মীমাংসাভার ভাষাতত্ত্ববিদের স্কন্ধে সমর্পণ করিয়া আমি আত্মকাহিনী লইয়াই অবতীর্ণ হইলাম।

কিন্তু কি বলিতেছিলাম,—সহপাঠী। অনুকূল ও আমি,—এই দুইজন ক্লাসের রত্নবিশেষ,—বিক্রমাদিত্যের সভায় যেমন নবরত্ন শোভা পাইত, আমরাও তাদৃশ রত্নস্বরূপ ছিলাম। তবে অন্য সপ্তরত্নের অভাব বিলক্ষণ ছিল,—সে সকল পদগৌরবের উপ-

যুক্তও কেহ ছিল না। তজ্জন্য বিদ্যালয়ের সত্ত্বাধিকারী মহাশয়ের কোন প্রকার দুঃখ ছিল কিনা, বলিতে পারি না।

অনুকূল ও আমি দুইজনই 'কবি।' কিন্তু আমাদের কবিত্বের ভিতর বিলক্ষণ বিভিন্নতা ছিল। প্রথমের কবিতা কিঞ্চিৎ আদি রসাশ্রিতা,—কামনার জ্বলন্ত-বহ্নি তাঁহার প্রতি ছত্রেই ফুটিয়া পড়িত। এই আদিরসপ্রাধান্য দেখিয়া আমি অনুকূলের নাম দিয়াছিলাম, 'কালিদাস।' ক্লাসের অন্যান্য ছাত্রেরাও তাহাকে মাঝে মাঝে ঐ নামে অভিহিত করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত।

'ইট্ মারিলেই পাট্‌কেল্ খাইতে হয়!'—অনুকূল আমার বীরভাব দেখিয়া, আমার নাম 'বররুচি' দিয়াছিল। কিন্তু বররুচির সহিত বীররসাশ্রিতা কবিতাসুন্দরীর কি সম্পর্ক, তাহা আমার দীন বুদ্ধি কিছুতেই বুঝিতে পারিত না। তাই আমি ঐ অভিধেয়টীকে 'উপমা কালিদাসস্য' ভাবিয়া নির্ব্বাকের ন্যায় নীরব রহিতাম।

তবুও আমার নিস্তার ছিল না। কলির কালিদাস এক একদিন বঙ্গের বর্ত্তমান বররুচিকে লইয়া বেজায় টানাটানি করিতেন। কার্য্য—কেবল কবিতা শুনা। আবার কবিতাই বা কি!—বেচারা বররুচির প্রাণের ভিতর বালুকার ন্যায় কেমন 'কির্ কির্' করিয়া উঠিত। তবে সর্ব্বশেষে বিবিধ সসার দ্রব্য প্রাণের পার্শ্ব দিয়া গহ্বরবিশেষে গিয়া হজমের জন্য অবস্থান করিত বলিয়া নেহাৎ সাধুসন্ন্যাসীর ন্যায় সংযত ভাবে বররুচি সেই সকল কবিতাকুসুমাস্ত্রগুলি বক্ষ পাতিয়া লইত,—মূর্চ্ছাদেবী কিশোরীর প্রথমযৌবনোচ্ছ্বাসে বিচিত্র লাবণ্যবৎ আসিতে আসিতেও ছুটিয়া পলাইয়া যাইতেন।

যাহা হউক, কবিত্ববিষয়ে আমাদিগের ভিতর পার্থক্য থাকিলেও বন্ধুত্ববিষয়ে কোন অনৈক্য ছিল না। আমরা দুইজন সহোদর ভ্রাতার ন্যায় সচরাচর একত্রে বিহার করিতাম। অন্যান্য সহপাঠীরাও তাহাই ভাবিত। সুতরাং এই বন্ধুত্ব যে কদাচ কলহ দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইবে, এইরূপ সম্ভাবনা ছিল না। আমরাও ঐ আশা কখনও করি নাই।

[২]

এইরূপে আমাদের ছাত্রজীবন অতিবাহিত হইল। উভয়ে পরস্পরের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী,—উভয়েই অবিবাহিত,—ভাদিকে অন্নবস্ত্রেরও কোন চিন্তা ছিল না,—জীবনটাও তাই বেশ আমোদ-প্রমোদে কাটিয়া গেল। আমরা যৌবনের নবীন কল্পনা লইয়া এখন কার্য্যের পুণ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম।

কিন্তু অগ্রসর হইবার পথ উভয়ের বিভিন্ন হইল। অনুকূলচন্দ্র জীবনের পরপারে মমতাস্মৃতির ন্যায় আপন ছাত্রজীবন পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। কোন কালেজের প্রোফেসারীর পদ লইয়া কলির কালিদাস সেক্ষপীয়র (Shakespeare), মিল্টন (Milton), ড্রাইডেন্ (Dryden) পড়াইতে পড়াইতে ছাত্রদিগের উপর দিয়া আপনার আদিরসটা ছুটাইয়া দিতেন। সে আদিরসমহাস্রোতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যার্থীরা কখনও কোথায় ক্ষুদ্র তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইত কিনা, এই সংবাদ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অলিখিত।

আর আমি?—আমি দ্বিবিভাগীকৃত স্কন্ধবিলম্বিত সুকুঞ্চিত কেশদামের উপর প্রকাণ্ড এক শাম্‌লা চড়াইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর কার্ত্তিকের ন্যায় বীরপদবিক্ষেপে প্রত্যহ হাইকোর্টের দ্বিতলস্থ

কক্ষগুলি অলঙ্কৃত করিতাম। মক্কেলের অভাবে আমার বীরবসটা বড় বেশী ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল,—বাণপ্রবাহে স্রোতস্বতীর উচ্ছ্বাসকেও পরাস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। তথাপি এই বীরত্ব দেখিয়া মক্কেল আসিবার কোন সম্ভাবনা ছিলনা। সুতরাং প্রত্যহ আমি আপন রূপলাবণ্য দেখিয়া দর্পণতলে ছায়ার ন্যায় নিজেই মুগ্ধ হইয়া যাইতাম,—প্রশংসা করিবার লোক একজনও পাইতাম না।

তবে এক বিষয়ে আমাদের ভিতর কোন বিভিন্নতা ছিল না। তাহা, আত্মোন্নতি (self-culture). অনুকূল ও আমি দুইজন একই পুস্তক পড়িতাম,—একই বিষয়ে তর্ক করিতাম,—একই সময়ে কবিত্বে নিমগ্ন হইয়া থাকিতাম। এই একতা এবং হৃদয়ের অনন্ত বন্ধন ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে আমাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন হইয়াছিল।

পূজার ছুটীর পূর্ব্বে অনুকূলচন্দ্র আমার বাটীতে একদিন আসিয়া উপস্থিত। পরস্পর কুশলসমাচারাদি জিজ্ঞাসার পর কালিদাস কহিল, "ভগা ! আমাদের দেশে বেড়া'তে যা'বি ?"

আমার নাম, ভগবানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমি বলিলাম, "গেলে হয়। রেলভাড়া দিয়ে নিয়ে যা'বি ?"

"নিশ্চয়ই।"

"তবে যা'ব।"

ইহা স্থির হইয়া গেলে ছুটি হইবার পর দিনই আমরা দুই বন্ধুতে কলিকাতা ত্যাগ করিলাম।

[৩]

অনুকুলচন্দ্রের দেশ নদীয়া জেলার রাণাঘাটে। রাণাঘাট স্থান মন্দ নয়,—নূতন বলিয়া দেশটা আমার কাছে লাগিয়াছিল ভ

ভাল। তবে স্থানটা যে অনুকূলচন্দ্রের স্থায় একজন আদিরসাশ্রিত কবির জন্মস্থান, ইহা আমার মতে কেমন বিসদৃশ ঠেকিয়াছিল। কেননা, রাণাঘাটের প্রাকৃতিক দৃশ্য উক্তরসমিশ্রিত ছিলনা। তবে পচা পুকুরেও কখন কখন পদ্ম ফুটিয়া থাকে, এই যা' বল।

বন্ধুবর দেশে আসিয়া অবধি আমায় লইয়াই বেজায় ব্যস্ত,—দুই দণ্ড বাটীর ভিতর বসিয়া গল্প করিবার উপায় নাই। তবুও সৌভাগ্য যে, কালিদাস বিবাহ করেন নাই। গৃহে গৃহিণীদেবী সগৌরবে অধিষ্ঠান করিয়া থাকিলে, এবং বন্ধুর জন্য এইরূপ ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহাকে দেখা না দিলে সুরভিশাপে দীলিপের ন্যায় আমারও যে নির্ব্বংশ হইতে হইত, ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। তাহার পর, নন্দিনীর সাক্ষাৎ না পাইলেই মুস্কিল,—হয় ত চিরজীবনের মত তাঁহার অভিশাপটা আমার প্রাণের ভিতর কিলিবিলি করিয়া বেড়াইত। তাই আমার মঙ্গলের জন্য উক্তা মহাদেবীর শুভাগমন অনুকূলচন্দ্রের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই।

যাহা হউক, আমরা একদিন পরামর্শ করিয়া নিকটস্থ এক সরোবরে স্নান করিতে গেলাম। উদ্দেশ্য—সাঁতার কাটা। সরোবরটী প্রশস্ত,—জল অগাধ, স্বচ্ছ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র। তড়াগের মধ্যস্থলে কমলগুচ্ছ,—প্রখররবিকরে প্রমদার শেষ যৌবনের ন্যায় ঈষৎ পরিম্লান। সরোবরের অপর তীরে গ্রামের স্ত্রীলোকেরা অবগাহন করিতেছিল।

স্নান করিবার জন্য ঘাটে অবতরণ করিতেছি, এমত সময়ে স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তনাদ ঘাটের অপর পার্শ্ব হইতে আসিয়া আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। আমরা দুই বন্ধুতে বিস্মিত হইয়া সেইদিকে দৃষ্টি করিলাম। দেখিলাম, একজন রমণী ডুবিতেছে,—

অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা প্রাণপণে চীৎকার করিতেছে। বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া বন্ধুবর সাঁতার কাটিয়া বিপন্নাকে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইলেন। আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

রমণীর নিকটে আসিয়াই বন্ধুবর তাহার কেশগুচ্ছ ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন। জীবনের মমতায় রমণী অনুকূলচন্দ্রকে যথাশক্তি আকাড়াইয়া ধরিল। ব্যাকুবের ন্যায় জ্ঞানশূন্য হইয়া আমি দেখিলাম, বন্ধুবরও রমণীর সঙ্গে সঙ্গে ডুবিতে লাগিলেন।

ভগবানকে ধন্যবাদ—আমার এই বিমূঢ়তার ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। দুইজনকে পুনরায় নিমগ্ন হইতে দেখিয়া আমি রমণীর হস্তাকর্ষণ করিলাম। বিপন্না তখন অনুকূলচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া আমায় জড়াইয়া ধরিল। হস্তপদবদ্ধ হইয়া আমিও তাহার সহিত অগাধসলিলে নিমগ্ন হইতে লাগিলাম।

তখন তাহাকে বাঁচাইবার জন্য আমি এক কৌশল অবলম্বন করিলাম। দুই হস্তে রমণীর কটিদেশ ধারণ করিয়া আমি তাহাকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া স্বয়ং নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ডুবিয়া রহিলাম। এইভাবে কতক্ষণ রহিলাম বলিতে পারিনা,—আমার শরীর ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। শেষে যে কি হইল, তাহার আমি কিছুই জানিনা।

* * *

* * *

[৪]

কি সুন্দর দেশ, কি সুন্দর নরনারী, কি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। চতুর্দ্দিকে রক্তিম উষার দীপ্তরাগ কনকমহিমায় ফুটিয়া পড়িতেছে। ত্রিদিবসুবাসপূর্ণ সুধীর গন্ধবহ মৃদুমন্দ সঞ্চালিত,—

নন্দনসৌরভ প্রাণে বিস্মৃতির ছায়া মিশ্রিত করিয়া দেয়। বিচিত্র পাদপপ্রশাখায় বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র বিহঙ্গমদল,—তাহাদের বিচিত্র মধুরারাবে দিল্খুশা কিশোরী-দেহে বিচিত্র যৌবনোচ্ছ্বাসবৎ মৃগ্ধারতা,—এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ অপূর্ব্ব আলেখ্য স্বপনের দেশেই শোভা পায়।

এই স্বপনের রাজ্যে,—এই বিস্মৃতির পুণ্যময় পুরে,—এই স্বর্গীয়লাবণ্যরচিত ভক্তজনবাঞ্ছিত মুকুলিত কল্পনানগরে ললিত-লতিকাবিরচিত কমনীয় কুঞ্জমধ্যে রক্তরত্নবিমণ্ডিত সিংহাসনোপ-বিষ্টা নারীমূর্ত্তি,—সর্ব্বাঙ্গে অমরাঙ্গনার ছায়াসৌন্দর্য্য শারদপূর্ণ-চন্দ্রিকার ন্যায় আলস্যে ক্রীড়া করিতেছে। কুঞ্জের লতিকায় লতিকায় হীরকরত্নমণিতুল্য অনন্তকুসুমকামিনী,—অপূর্ব্ব পত্রান্তরে অবগুণ্ঠনবতী যুবতীর ন্যায় মৃদুমন্দ হাস্য করিতেছে। দূর হইতে অপ্সরাকণ্ঠবিনিঃসৃত বিভ্রমসঙ্গীত ধীরসমীরণের সহিত ভাসিয়া আসিয়া প্রকৃতিহৃদয়ে বিলাসলালসার সৃষ্টি করিতেছে।

রমণী ছায়াময়ী। সে ছায়া কল্পবৃক্ষকুসুমে বিচিত্র চন্দ্রিকাকেও লজ্জা দিতেছে। জগতে সে ছায়ার উপমা অতীব দুর্লভ,—অতুল বিচিত্র সৌন্দর্য্যের উপর সরল সুন্দর হৃদয়ের যে অপার্থিব ছায়া পড়ে, তাহাও তাহার নিকট অতুলনীয়। কি এক সুখস্বপন-মদিরায় রমণীর রক্তাধর ধীরে ধীরে কম্পিত হইতেছিল।

সহসা উপবিষ্টার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাঁহার সেই পারিজাতসুনির্ম্মলহাস্যবিকশিত স্নিগ্ধমদিরাচ্ছন্ন প্রশান্ত বদনমণ্ডলে গাম্ভীর্য্যের একটা কঠিন জলদছায়া ধরার অন্ধকারের ন্যায় ফুটিয়া উঠিল। বিস্ময়ে চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখি, একজন পুরুষ রমণীপার্শ্বে আগমন করিবার জন্য সহাস্য বদনে অগ্রসর হইতেছে।

আগন্তুককে দেখিতে পাইয়া রমণী দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তাঁহার সর্ব্বদেহ প্রবলবাত্যান্দোলিতা লতিকার ন্যায় ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল। প্রমদার ছায়াময় লাবণ্যরাশি শেষনিশার ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর চন্দ্রমার ন্যায় মলিনতাচ্ছন্ন হইতে লাগিল।

পুরুষমূর্ত্তি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সেই প্রসন্ন বদনমণ্ডলে নৈরাশ্যের ম্লান ছায়া প্রদোষমহিমায় ভাসিয়া উঠিল। আমি বিমূঢ়ের ন্যায় ভাবহীনদৃষ্টিতে উভয়ের প্রতি চাহিয়া রহিলাম।

দেখিতে দেখিতে উপবিষ্টার নয়নযুগল দিয়া দুইবিন্দু অশ্রু মৌক্তিকের ন্যায় সিংহাসনতলে পতিত হইল। তাহার পর মুহূর্ত্তেই একটা ঝটিকা আসিয়া পুরুষমূর্ত্তিকে কোথায় উড়াইয়া লইয়া গেল। আমি ও রমণী তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

*   *   *

*   *   *

[৫]

সুন্দর নিদ্রা,—সুখের স্বপ্ন। এমন সুখস্বপনের নিদ্রা ভঙ্গ হয় কেন? যাহাতে জীবন অমরতা লাভ করে সে বস্তু ক্ষণস্থায়ী কেন?

পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া চাহিয়া দেখি, প্রশস্ত কক্ষ। কক্ষভিত্তিতে আদিরসান্বিত বিচিত্র আলেখ্যাবলী,—তবে অশ্লীলতার আভাষ তাহাতে কণামাত্রও নাই। উন্মুক্ত বাতায়নপথ দিয়া প্রভাতের রক্তিমরাগরাশি কক্ষতলশয়ানা নিমীলিতনয়ানা অমরাঙ্গনার রূপলাবণ্যে ললিতলহরীর সঞ্চার করিতেছে। আমি বিমূঢ়ের ন্যায় স্তম্ভিত ভাবে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলাম।

রমণী বোধ হয় তখন স্বপ্ন দেখিতেছিল। প্রভাতসমীরণ তাহার কৃষ্ণফণীতুল্য অলকাবলী লইয়া রঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল;

উড্ডীয়মান কেশরাশি প্রমদার অরুণরঞ্জিত কপোলদেশ মধ্যে মধ্যে চুম্বিতেছিল,—কভু বা কর্ণভূষণসংলগ্ন হইয়া চাম্পেশোৎপলের পীড়া জন্মাইতেছিল। রমণীর তাহাতে কোন সংজ্ঞা নাই;—তাহার বিম্বাধর কেবল সুখসমীরচুম্বিত বিচিত্র পত্রের ন্যায় মৃদু-মন্দ কম্পিত হইতেছিল। সেই দেবীদুর্লভ অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া রহিলাম,—অতীতের স্মৃতি নববধূর প্রেমসম্ভাষণবৎ আসি আসি করিয়াও আসিতেছিল না।

আমার মস্তকের ভিতর কেমন গোলমাল হইতে লাগিল। সহস্র আয়াস সত্ত্বেও কোন অর্থই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। আমার সর্ব্বশরীরে স্বেদরাশি শিশিরের ন্যায় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। আমি পরিশ্রান্ত হইয়া পুনর্ব্বার নয়ন মুদ্রিত করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস আমার নাসিকাপ্রান্ত ছাড়াইয়া মুক্ত বায়ুর সহিত ভাসিয়া গেল।

নিশ্বাসশব্দ বোধ হয় নিদ্রিতার কাণে গিয়া বাজিল। কেননা, সে পরমুহূর্ত্তেই আমার শিয়রে আসিয়া উপবেশন করিয়া বীজন করিতে লাগিল। আমি নিমীলিত নয়নেই বলিলাম, "তুমি কে?"

বীণাকম্পন মধুর কণ্ঠে উত্তর হইল, "আমি প্রমদা।"

প্রমদা!—প্রমদা কে? এ নাম ত ইতিপূর্ব্বে আর কখনও শুনি নাই? তবে এ কোথা হইতে আসিল? আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল।

প্রমদা পুনর্ব্বার বলিল, "এখন তুমি কেমন আছ?"

কেমন আছি?—এই কথারই বা অর্থ কি? কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন হতাশ হইয়া আর একবার নয়ন মেলি-লাম। দেখিলাম, সে নয়ন নত করিয়া উপাধানের কোণ খুঁটিতে

লাগিল। আমি স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় পুনর্ব্বার বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। কেবল একটী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, "তুমি কি এতক্ষণ স্বর্গে ছিলে ?"

আমার কথার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া প্রমদা নীরব রহিল। আমি বুদ্ধিভ্রষ্টের ন্যায় কত কি চিন্তা করিতে লাগিলাম।

দুই-চারি মুহূর্ত্ত পরে একজন কে গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিবামাত্রেই প্রবেষ্টাকে চিনিতে পারিলাম। সে—অনুকূল।

অনুকূল আমায় দেখিয়া বলিল, "এখন কেমন আছিস্ ভগা ?"

বিস্ময়ের সহিত আমি কহিলাম, "আমার কি হ'য়েছে ?"

"জলে ডুবেছিলি—মনে নেই ?"

এই একটী বাক্যেই আমার পূর্ব্বস্মৃতি মুহূর্ত্তে ফিরিয়া আসিল। তখন সেই বিপন্না স্ত্রীলোক হইতে মদীয় অন্তিমঅবলম্বনগ্রহণ পর্য্যন্ত সকল কথাই হৃদয়ে আমার জাগিয়া উঠিল। তখন আমি বুঝিলাম, এই প্রমদাই সেই বিপন্না প্রমদা।

তাহার পর, দুই বন্ধুতে নানাবিধ কথাবার্ত্তা হইল। কথাপ্রসঙ্গে জানিতে পারিলাম, প্রমদাদের সহিত বন্ধুবরগৃহের খুব ঘনিষ্ঠতা,—প্রমদা তাই অনুকূলের বাটীতে অনায়াসে যাতায়াত করে। আমি তাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে গিয়া নিজে পীড়িত হইয়াছি বলিয়া আজ একুশ দিন ধরিয়া প্রমদা দিবানিশি আমার শুশ্রূষা করিতেছে। আমি ভাবিলাম, রহস্য ত মন্দ নয়!

[৬]

প্রায় দুই সপ্তাহ পরে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলাম। এই দুই সপ্তাহের ভিতর প্রমদা অধিকাংশ সময়ই আমার নিকট

অবস্থান করিত। এই একত্রসহবাসে আমি প্রমদার দেবীতুল্য পবিত্র হৃদয়ের অনেকটা আভাষ পাইলাম।

সুস্থ হইলাম বটে, কিন্তু একটা রোগ লুক্কায়িত শত্রুর ন্যায় অজ্ঞাতসারে আমায় আক্রমণ করিল। তখন উহাকে চিনিতে পারিলে প্রতীকারের পথ বন্ধ থাকিত না। কিন্তু রোগের লক্ষণই গুপ্ততা।

অনুক্ষণ একত্রসহবাসে প্রমদার প্রতি প্রাণে কেমন একটা আকর্ষণ জন্মিল। তোমরা ইহাকে 'প্রেম' বল, 'বন্ধুত্ব' বল, বা 'চ'খের নেশা'ই বল, আমার তাহাতে কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, প্রমদার আসিতে বিলম্ব হইলে আমার কৌমার হৃদয় সান্ধ্য সমীরণের ন্যায় অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিত।

এখন আমার পাঠকপাঠিকাগণের ভিতর সকলেই বলিবেন, ইহা যে অনুরাগ! অনুরাগ?—মন্দ কি? এ জগতে কে অনুরাগী নয়? জীবনের পবিত্র ঊষাকালে শিশুর দেবচক্ষে যখন স্বর্গাবাসের মধুরোজ্জ্বল পুণ্যমূর্ত্তি বিকশিত হইয়া উঠে,—যখন সেই অপূর্ব্ব-দর্শনে প্রীত হইয়া দর্শকের সরলোষ্ঠে পবিত্রতার শুভ্র হাসি ফুটিয়া উঠে, তখন সেই হাসি কি অনুরাগের নয়? উপরে অনন্তনীলা-কাশে কোটিমহিমায় পূর্ণচন্দ্রমা বিরাজমান দেখিলে বারিধির বিরাটবক্ষ যখন মহাভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তখন সেই ভাব কি অনুরাগ নয়? যখন প্রভাতরক্তিমরশ্মি প্রকৃতির বিচিত্র দেহে কনকমহিমার সৃষ্টি করে এবং সেই সৌন্দর্য্যব্যাপকতায় নিসর্গগায়-কের অমিয়কলতানে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হয়,—সে সৌন্দর্য্য, সে সঙ্গীত কি তখন অনুরাগ নয়? তবে এই অনুরাগে আমার দোষ কি?

যাহা হউক, আমি শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরিব স্থির করিলাম। সুযোগ পাইয়া একদিন অনুকূলচন্দ্রকে আমার বাসনা পরিজ্ঞাত

করিলাম। বহুদিবস দেশ হইতে আসিয়াছি,—অনিচ্ছাসত্ত্বেও বন্ধুবর এ সংকল্পে আমার দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না।

রাণাঘাট হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে প্রমদা আমার গৃহ-গমনেচ্ছার কথা শুনিল। সেইদিন হইতেই আমি তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিলাম। সদাসর্ব্বদা সে অতীব বিষণ্ণা,—নীলোৎপল-তুল্য নয়নযুগল প্রাবৃট্‌জলধরসদৃশ ছলছল। এই ভাবান্তরের কারণ কি, তাহা তখন বুঝিতে সক্ষম হইলাম না।

বিদায়ের পূর্ব্বদিন প্রমদা এবং তাহার পিতাঠাকুর আমায় এবং অনুকূলচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিলেন। বন্ধুবর নিমন্ত্রণে কোন আপত্তি করিলেন না,—বোধ হয় সে নিমন্ত্রণে কোন কিছু কবিত্বময় রসনাসাধনযোগ্য অপূর্ব্ব পদার্থের আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার কেমন লজ্জা করিতে লাগিল,—কবিত্বের বীররসটাও তাহাকে বাধা দিতে সমর্থ হইল না। শেষে নিমন্ত্রণকারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সবিশেষ আত্মীয়তা ও স্তুতিবাক্যে আমি আর উপেক্ষা করিতে পারিলাম না,—ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাঁহার নিমন্ত্রণ-গ্রহণে বাধ্য হইলাম।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্থান করিলে পর আমি বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, আমার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইল কেন? যে আমি দুই-দিন পূর্ব্বে সকল সময়ই সপ্রতিভ ছিলাম, সেই আমি এখন এইরূপ হইলাম কেন? কেন?—কি জানি?

[৭]

আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া মনটা সাতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমার প্রাণের ভিতর কিসের একটা করুণ সঙ্গীত দূর

বাঁশরীনিশ্বাসের ন্যায় অনবরত ধ্বনিত হইতে লাগিল। এই সময় আমার কল্পনাবিরচিত হৃদয়কাননে কোন বসন্তবিহারিণী জ্যোৎস্না-ময়া স্বপনকন্যার অদৃশ্যপ্রতিভার অভাব পরিলক্ষিত হইল।

চিত্ত স্থির করিবার জন্য আমি একান্ত ভক্তের ন্যায় কবিতা-সুন্দরীর আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। যখনই মনের ভিতর প্রবাস-স্মৃতি জাগিয়া উঠিত, তখনই আবেগোদ্বেল হৃদয়ে কবিতারচনায় প্রবৃত্ত হইতাম। অতীতের উত্তালতরঙ্গোচ্ছ্বাসে আমার দুর্ব্বল জীবন ছন্দের পূত সেতুবন্ধে ত্বরিতপ্রয়াণ করিয়া শান্তির অনির্ব্বচ-নীয় পুণ্য সঞ্চয় করিত,—হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতার পবিত্র পরশে নিশ্বাসে নন্দনপ্রসূনপ্রতিভা ঢালিয়া দিত। সেই স্নিগ্ধ সৌরভে আমি দেবতার ন্যায় অমরতালাভ করিতাম।

তবে এক বিষয়ে কবিতার সুর ফিরিল। ইতিপূর্ব্বে স্বরচিত কবিতায় বীররসের প্রাধান্য ছিল, এখন তাহাতে করুণরসের প্রাবল্য ঘটিল। পূর্ব্বে প্রকৃতিপ্রতিমার অনাদি, অনন্ত, অজ্ঞেয় মহিমায় অনুপ্রাণিত হইয়া বিশ্বস্রষ্টার গুণকীর্ত্তণে প্রবৃত্ত হইতাম, এখন তদ্‌পরিবর্ত্তে কুহেলিকাচ্ছন্ন কাহার অস্পষ্ট ছায়া মহামহিমা-ন্বিতার ন্যায় আপন অসীমপ্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। সে মূর্ত্তি কদাচ আপন প্রকৃতরূপে দেখা দিতনা,—মায়াবিনীর মায়া-ক্রীড়াবৎ প্রতিক্ষণেই তাহা বিভিন্ন আকার ধারণ করিত। সুতরাং তাহা কাহার মূর্ত্তি তাহা সহজে চিনিবার উপায় রহিল না।

এইরূপে একবৎসর অতিবাহিত হইল। এই এক বৎসর মধ্যে আরও তিনচারিবার অনুকূলচন্দ্রের সহিত তাহার দেশে গিয়া-ছিলাম। কিন্তু তাহাতেও তাদৃশ শান্তিলাভ হয় নাই। কি এক বিষম আকাঙ্ক্ষায় আমার ক্ষুদ্র হৃদয় অনবরত মথিত হইত।

শেষবার রাণাঘাটে অবস্থানকালে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একদিন আমার বংশপরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সকল কথাই অকপটে বিবৃত করিলাম। তিনি সমস্ত অবগত হইয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সকলই অদৃষ্ট।"

দুই দিন পরে আমি কলিকাতায় ফিরিলাম। কিন্তু লইয়া আসিলাম—অতৃপ্তি, নৈরাশ্য, প্রলয়ের ঘোরান্ধকার। কত আশা করিয়া, বাসনার কত নন্দনগৌরবময় কনকমালিকা লইয়া, অপ্সরাসঙ্গীতমুখরিত ইন্দ্রবিলাসভবননাট্যগৃহের অশেষদৃশ্যপট-সমন্বিত বিচিত্র সৌন্দর্য্যবৎ অনন্ত লাবণ্য নয়নে ধরিয়া প্রবাসে গিয়াছিলাম, কিন্তু ফিরিবার সময় পাইলাম, অদর্শননৈরাশ্যভার, শতবর্ষের বিশুষ্ক হার, অক্ষিযুগে বেদনার তীব্র অশ্রুধার। জীবনের উৎসাহ লইয়া রাণাঘাটে গিয়াছিলাম, গৃহে ফিরিলাম অবসাদ লইয়া! হায়! ইহাই কালের বিচিত্র গতি।

প্রমদার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। শুনিলাম, তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। সেইজন্যই কি প্রমদা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিল না?

যাহা হউক, কলিকাতায় আসিয়া যাতনা বিস্মৃত হইবার জন্য আমি নানাবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলাম। আমার সৌভাগ্যবশে এই সময় কিঞ্চিৎ 'পশার' হইল,—দুই একদিন অন্তর 'মক্কেল' জুটিতে লাগিল। অর্থের সহিত তাদৃশ সম্বন্ধ না থাকিলেও আমি প্রত্যেক মক্কেলেরই সন্তুষ্টিবিধান করিতে লাগিলাম। এই-রূপে দিবসের অধিকাংশ সময় আমি অন্যমনস্ক হইয়া থাকিতাম।

সহসা একদিন অনুকূলচন্দ্র আমার বাটীতে আসিল। স্মিত মুখে সে বলিল, "ভগা! একটা সুখবর আছে। কি দিবি বল্।"

"কি আর দিব? তবে কবিতা-রচনার বিষয় ব'লে দিতে পারি। যথা, 'নোলক', 'হাঁচি', 'দাঁত'—

বাধা দিয়া অনুকূল বলিল, "তামাসা নয়,—সত্যি সুখবর।"

"কি শুনি?"

"মাঘ মাসে মম পরিণয়, কল্পনায় বীণার উদয়, এবে সখা! কি হয় কি হয়!"

"শুষ্ক হ'বে রস সমুদয়! তা পাত্রীর নামটী কি?"

"শুনে বল্ দেখি?"

"ব'ল্‌ব তবে? পাত্রীর নাম 'মন্‌সাদেবী' "

"দূর!—প্রমদা।"—এই বলিয়া অনুকূলচন্দ্র আমূল বৃত্তান্ত বন্ধুবরকে শুনাইতে লাগিলেন। কথাপ্রসঙ্গে জানিতে পারিলাম, প্রমদা আমারই হইত; তবে আমাদের ভাঙ্গা কুল বলিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যা' আপত্তি।

প্রমদা আমারই হইত!—কুজ্‌ঝটিকাসমাচ্ছন্ন বিকাশোন্মুখ বিচিত্র শতদল কাহার অদৃশ্যপ্রভাবে যেমন ফুটিবার উপক্রম করিতে থাকে, অথচ সে হৃদয়বিকাশক কে, তাহা বুঝিতে সক্ষম হয় না, কিন্তু সামান্য আঘাতেই কুজ্‌ঝটিকা অপসারিত হইয়া গিয়া বল্লভমোহিনীমূরতিমহিমায় হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তেমনি সখ্যকুজ্‌ঝটিকাসমাচ্ছন্ন আমার হৃদয়কমলও প্রমদার অজ্ঞাত অদৃশ্যপ্রভাবে ফুটিবার উপক্রম করিতে করিতে, বন্ধুবরের এই উক্তির আঘাতে সখ্যতা অপসারিত হইয়া গিয়া, প্রমদার প্রণয়মহিমায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইতিপূর্ব্বে যাহা সন্দেহও করি নাই, আজি কালগতিকে তাহাই ঘটিল। পূর্ব্বে যাহা স্বপ্ন বলিয়া জ্ঞান করিতাম, আজি তাহা ধ্রুবসত্যে পরিণত হইল।

কিন্তু ইহাতে আর লাভ কি? অনুকূলচন্দ্রের মুখেই ত শুনিলাম, প্রমদা আমার হইবে না! আমার হইবে না জানিয়াও অধিষ্ঠাত্রী মূর্ত্তির পূজা করি কেন? মৃগতৃষ্ণিকার নিষ্ফল পশ্চাদ্ধাবনে কি ফললাভ হইবে? প্রতিদানবিহীন আত্মসমর্পণে সুখ কি?

লাভ—সুখ কে বলিবে? তবে এইমাত্র বলিতে পারি, ইহাই স্বাভাবিক! বৈতরণীপারস্থিত বল্লভজনের পবিত্র স্মৃতিতে মানবের কি লাভ?

তবে এই বিষাদমধ্যে সুখ—প্রমদা অনুকূলচন্দ্রের পত্নী হইবে। আমি সুখী না হই, বন্ধুবর ত হইবে? জীবনের প্রভাত অবধি আমায় সুখী করিবার জন্য অনুকূল কত স্বার্থত্যাগ করিয়াছে, আর আমি তাহার জন্য কি এই স্বার্থে বিসর্জ্জন দিতে পারি না?

ইহা স্থির করিয়া আমি হৃদয় দৃঢ় করিতে লাগিলাম।

[৮]

মাঘ মাসের প্রারম্ভে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সপরিবারে কলিকাতায় আগমন করিলেন। কলিকাতা হইতেই প্রমদার বিবাহ হইবে, ইহা অনুকূলচন্দ্রের অভিলাষ,—পিতামাতার 'সবে ধন নীলমণি' বলিয়া ইচ্ছাটাও পূর্ণ হইয়াছিল। আমি প্রমদা বা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম না। তবে প্রথমার সহিত দেখা করিতে এক একবার ইচ্ছা যে না হইত, এমত নহে। কিন্তু কার্য্যকালে কেমন একটা বাধা আসিয়া আমার সকল সংকল্পই ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিত।

অনুকূলচন্দ্র আমার এই ভাব অবলোকন করিত কিনা, বলিতে পারি না, কিন্তু এক একদিন সে তাহার ভাবী শ্বশুরালয়ে আমায় লইয়া যাইবার জন্য সাতিশয় পীড়াপীড়ি করিত। আমি অপ্রস্তুতের

ন্যায় নানাবিধ অবান্তর প্রসঙ্গ আনিয়া প্রকৃত প্রসঙ্গ চাপা দিতাম, —অনুকূলচন্দ্রের সকল অনুরোধই তাহাতে ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের ন্যায় কোথায় ডুবিয়া যাইত। বন্ধুবর প্রমদাদের বাটীতে আমায় লইয়া যাইতে সক্ষম হইলেন না।

পরিণয়ের আর সাতদিন মাত্র বাকী আছে। সহসা একদিন দেখিলাম, অনুকূলচন্দ্রের ভাবান্তর উপস্থিত। আমার প্রতি ভাব-হীন দৃষ্টিতে সে প্রতিক্ষণেই চায়,—কি যেন বলি বলি করিয়াও বলিতে পারে না। আমি তাহার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে বিস্মিত হইলাম, কিন্তু হেতুনির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হইলাম না।

দিন দুই পরে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার কন্যার গাত্রহরিদ্রা ও বিবাহদিনে আমার উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়,—নহিলে শুভকার্য্য সুসম্পন্ন হইবে না। আমি প্রমদার প্রাণদান করিয়াছি,—প্রমদা আমায় কত ভালবাসে, —আজ আবার তাহার বিবাহ,—এমন আনন্দদিনে কি আমার না যাওয়া উচিত! আর তাঁহারা আমার নিকট অনেক আশা করেন,—সেই আশায় তাঁহাদিগকে নিরাশ করা আমার মত মহানুভব ব্যক্তির (দেবতার নয় ত?) পক্ষে উপযুক্ত হয়না,— বিশেষতঃ, ভাবী জামতার যখন আমি সহপাঠী, ও বিশিষ্ট বন্ধু। তাঁহার মিনতি দেখিয়া আমি অগত্যা নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলাম।

কিন্তু কি ভীষণ পরীক্ষাই আরব্ধ হইল। একদিকে কল্পনা-বৈচিত্র্যময়ী মধুমাসপ্রসবাবির্ভাবকারিণী কলতানমুখরিতা দয়িতার ত্রিদিববিহারিণী পবিত্র মূরতি,—প্রতি দৃষ্টিতেই তাহাকে আপনার অধিক ভাবিয়া হৃদয়সরোজসিংহাসনে লক্ষ্মীর ন্যায় চিরাধিষ্ঠান করাইতে ইচ্ছা করে;—অপর দিকে কর্ত্তব্যের কুলিশবন্ধন,—প্রতি

মুহূর্ত্তেই জীবনের সর্ব্বসাধ দূরে নিক্ষেপ করিতেছে,—এমত ভীষণ সন্ধিস্থলে আমার কি করা উচিত? একদিকে প্রলোভনের দীপ্ত প্রতিমূর্ত্তি,—পারিজাতপ্রসূনতুল্য সৌন্দর্য্যকাব্যের সঞ্জীবনীসুধা সর্ব্বাবয়বে প্রবহমান,—স্পর্শমাত্রেই জীবন অমর হইয়া উঠে;—আর অন্যদিকে সমাজের কঠিন করাঘাত,—অপবিত্রতার ছায়া নিকটে আসিবার সামর্থ্যও নাই,—এইরূপ স্থলে কোন্ পথ অবলম্বন শ্রেয়ঃ? একদিকে শান্তির শান্তোজ্জ্বল বিচিত্র ছবি; অপর দিকে কৃতান্তের নির্ম্মম হাসি,—এখন কাহার স্মরণ লওয়া কর্ত্তব্য?

ভাবিয়া স্থির করিলাম, আমি দ্বিতীয় পন্থাই অবলম্বন করিব। আমার স্বার্থই কি এত বড়? আমার ক্ষুদ্র সুখের জন্য কি অপরের সুখে বিসর্জ্জন দিব? ইহাই কি মনুষ্যত্ব? এতদিন ধরিয়া কি কেবল ইহাই শিক্ষা করিলাম?

[৯]

বিবাহের দুই দিন পূর্ব্বে প্রমদার গাত্রহরিদ্রা। গাত্রহরিদ্রার দিন প্রভাতেই আমায় চট্টোপাধ্যায়-গৃহে যাইতে হইল। অনুকূলও আমায় এইরূপ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল।

প্রমদাকে উপহার দিবার জন্য আমি কতিপয় দ্রব্যসংগ্রহ করিয়াছিলাম। ধনবানের নিকট তাহা অতীব তুচ্ছ হইলেও আমার নিকট সেইগুলি স্বজীবনাপেক্ষাও মূল্যবান। সল্‌মাচুমকীর জামা, বা গোলাপী বম্বে শাড়ী, বা কনকনেক্‌লেস্, বা অটোডিরোজ প্রভৃতি সুবাসদ্রব্য, কিম্বা ইংরাজবাটীতে তোলা একখানি ক্যাবিনেট্ সাইজের ফটো ধনশালীর পক্ষে সামান্য হইলেও আমার নিকট তাহা মন্দারতুল্য বহুমূল্য,—জগতের সকল মণিরত্নই তাহার নিকট তুচ্ছ,—জীবনের বিনিময়েও তাহা অতীব দুর্লভ। আমার

হৃদয়ের সকল আশা, সকল ভরষা, সকল গীতি, সকল প্রীতি, সকল উৎসাহ দিয়া সেই উপহার গঠিত হইয়াছিল।

দ্বিপ্রহরের পর বরের বাটী হইতে গাত্রহরিদ্রা আসিল। প্রায় শতাবধি লোকজন,—জিনিষপত্রও বিস্তর আসিয়াছিল। চট্টো-পাধ্যায় মহাশয় সেইগুলি আমার হেপাজতে রাখিতে আদেশ দিলেন। আমিও তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে বাটীর ভিতর আমার ডাক পড়িল। আমি ঘোর অনিচ্ছার সহিত তথায় গেলাম। তত্ত্বানয়নকারিণী দাসীদিগের ভিতর একজন আমার হস্তে একখানি পত্র দিল। হস্তাক্ষর দেখিয়া চিনিলাম, তাহা অনুকূলচন্দ্রের। পত্র খুলিয়া পড়িলাম,

"ভগা! গায়েহলুদের আগে নিজে একটু হলুদ ছুঁয়ে নিস্। কপালের গেরো কাটবে।"

কি কঠিন পরিহাস! ছি! ছি! অনুকূল এমন। সেও আমার মর্ম্মবেদনা বুঝিল না!

পদের অঙ্গুলি হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত কিসের একটা তীব্র স্রোত বিদ্যুদ্গতিতে প্রবাহিত হইল। আমার সর্ব্বশরীর প্রবলবাত্যান্দো-লিত তরুবরের ন্যায় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। অমানিশার ন্যায় চক্ষে আঁধার দেখিয়া আমি তথায় জ্ঞানহীনের ন্যায় বসিয়া পড়িলাম। ইহার কারণ কেহ সম্যক্ অবগত হইল কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু সকলেই ব্যস্তসমস্ত হইয়া আমার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। আমি অতিশয় অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম।

এক দণ্ড পরে আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলাম। সুস্থ হইয়াই বহির্ব্বাটীতে পলাইয়া আসিবার জন্য দাঁড়াইয়া উঠিলাম। কি জানি যদি ধরা পড়ি!

বহির্ব্বাটীতে আসিতেছি, এমত সময় পশ্চাৎ হইতে কে আমার কাপড়ে খানিকটা হলুদ মাখাইয়া দিল। বিস্মিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, প্রমদার ছোট ব'ন সরলা অনূঢ়া যথিকার মতন হাসিতেছে। তাহার পানে চাহিবামাত্রই সে বলিল, "আজ কেমন জব্দ?" তাহার পর চপলার ন্যায় দ্রুত-গতিতে বালিকা তথা হইতে পলায়ন করিল।

যথাসময়ে সর্ব্বকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল,—আমি সেইদিনের মত পরিত্রাণ পাইলাম। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

অবসর পাইয়া আমি প্রমদার কনিষ্ঠা ভগ্নীকে একবার আহ্বান করিলাম। মুহূর্ত্তের ভিতর সে আমার নিকট আসিল। আমি তাহাকে কহিলাম, "প্রমদা কোথায়?"

"ঘরে গিয়ে শুয়েছে।"

"এত সকালে যে?"

"কি জানি?"

"তা'কে একবার ডেকে দিতে পার?"

"পারি।"

"একবার ডেকে দাও দেখি?"

প্রমদার ছোট ব'ন্ তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। আমি সহস্র উদ্বেগের সহিত প্রমদার আগমনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। বৃশ্চিক-দংশনসম কি এক দুর্ব্বহযন্ত্রণায় আমি ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম।

দণ্ড পরে প্রমদার অনুজা আসিয়া কহিল, "আপনি আসুন।"

এইবার আমি বিপদে পতিত হইলাম। পুনর্ব্বার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে কেমন বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। প্রমদাকে নিতান্ত আপনার ভাবিয়াও সকলের সাক্ষাতে তাহার নিকট যাইতে

সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। তোমরা ইহাকে 'মনের পাপ' বা বা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা, যাহাই বল, আমি উহা শুনিয়া ব্যাকুবের ন্যায় কেমন এক রকম হইয়া গেলাম। কেননা, আজ হৃদয়ের সার-সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে প্রমদার নিকট যাইতেছিলাম। আমার ভাবাবলোকন করিয়া বালিকা ক্ষণতড়িৎবিকাশের ন্যায় ফিক্ করিয়া ঈষৎ হাসিল। আমি নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম।

নিরুপায় হইয়া আমায় পুনর্ব্বার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে হইল। প্রমদার সহোদরা আমায় ত্রিতলস্থ ছাদে লইয়া গেল। ছাদে আসিয়া আমি দেখিলাম, প্রমদা এক কোণে নিশ্চল-প্রতিমার ন্যায় দণ্ডায়মানা রহিয়াছে।

এখন বিষম গোল,—প্রথমে কথা কহে কে? বিশেষতঃ প্রমদায় ও আমায় এখন কত বিভিন্নতা। একজন ভাবীসুখ-স্বপ্নরাশিতে নিমগ্ন, আর একজন আপনার মরণাবসাদ লইয়া বিষাদছায়ায় পরিদৃশ্যমান! একজনের চতুর্দ্দিকে নন্দনসুরভি গন্ধবহ মনে প্রবহমান, আর অপরের চতুঃপার্শ্বে মলিনতার তীব্র দুর্গন্ধ! একজন হাস্যময়ী, আর অপর নয়নলোরে অনবরত ভাসমান হইতেছে। এইরূপ স্থলে অগ্রে কাহার কথা কওয়া উচিত?

উচিতানুচিত রক্ষা হইল না,—আমি হৃদয়ের বেগ প্রশমন করিতে না পারিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিলাম, "প্রমদা!"

প্রমদা বলিল, "কেন? আমায় কি জন্য ডেকেছ? এখানে বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে পারব না।"

হায়! প্রমদা কি পাষাণী! যাহার জন্য জীবনের শত কনক-গ্রন্থি প্রতি মুহূর্ত্তে ছিন্নভিন্ন হইতেছে, আজ তাহার এই উত্তর! যাহাকে রক্ষা করিবার জন্য আপন জীবনেও উপেক্ষা করিয়া-

ছিলাম, আজ তাহার এই প্রতিদান! যাহার শতমহিমাবেষ্টিতা কল্পনাময়ী পবিত্র মূরতি লইয়া এতদিন ধরিয়া ভক্তের ন্যায় পূজা করিয়া আসিতেছিলাম, আজ তাহার এই ব্যবহার! স্ত্রীলোক কি জগতে এতই স্বার্থপর! ছি! ছি! নারীজন্মে ধিক্!

ঈষৎ ত্রস্তভাবে প্রমদা পুনর্ব্বার বলিল, "আমার সঙ্গে কি তোমার কোন কাজ আছে?"

কি কঠিন প্রশ্ন! উপরের পানে আমি একবার দৃষ্টি করিলাম। দেখিলাম, অনন্তনক্ষত্রখচিত অম্বরতলে চতুর্দ্দশীর চন্দ্রমা সুখস্বপনে নিমগ্ন,—অনুভূত প্রীতিরাশি ছায়ার ন্যায় জগতের উপর পতিত হইতেছে। দেখিলাম, একখণ্ড নীলমেঘ প্রবাহিত বায়ুপ্রভাবে অন্ধের ন্যায় ধীরগতিতে শশধর পানে অগ্রসর হইতেছে। দেখিলাম, শীতঋতুর হিমরাশি স্থলে স্থলে নিম্নে নামিয়া আসিতেছে। আমি একটী গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া প্রমদার প্রতি দৃষ্টি করিলাম।

মৃদু হাসিয়া প্রমদা বলিল, "কি জন্য ডেকেছ?"

তখন পুনর্ব্বার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আমি বুকের পকেট হইতে একটা বাক্স বাহির করিলাম। কম্পিত হস্তে ডালা খুলিয়া, প্রমদার সম্মুখে ধরিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিলাম, "তোমার সুখের দিনে এই তুচ্ছ 'নেকলেস্' ও আমার ফটো উপহার দিলাম! উপযুক্ত বোধ হয় 'নেক্লেস্'টা গলায় পরিও।"

অল্প হাসিয়া প্রমদা তাহা গ্রহণ করিল। বলিল, "আর কোন দরকার আছে কি?"—এই বলিয়া সে আবার হাসিল।

পূর্ব্ববৎ কম্পিতকণ্ঠে আমি উত্তর দিলাম, "না।"

চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে বায়ুর ন্যায় দ্রুতগতিতে প্রমদা প্রস্থান করিল। আমি বিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। কেবল আমার মনে হইতে লাগিল, এই কি তাহার পুরস্কার ?

[১০]

আজ বিবাহ।

প্রভাত হইতে না হইতেই ভৈরবী রাগিণীতে নহবতের মধুর ধ্বনি বড়ই জম্‌কাইয়া উঠিল। তরুণ তপনের তরল কিরণতরঙ্গরাশি আজ কি যেন অতীব বিচিত্র ভাব ধারণ করিল। পক্ষীরা সব আনন্দকলতানে বৈতালিকের ন্যায় প্রভাতীসুরে প্রকৃতির মহিমাগান করিতে লাগিল। জনকোলাহল সমস্ত রজনী বিশ্রাম লাভ করিয়া পুনর্ব্বার ধীরে ধীরে উত্থিত হইতে লাগিল। আমি এই সময় জাগরিত হইলাম।

জাগিয়া উঠিয়া আমি প্রাতঃকৃত সমাপন করিলাম। তাহার পর, বেশভূষা পরিয়া আমি বহির্ব্বাটীতে আগমন করিলাম। আসিয়া দেখি, অনুকূল আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। নিকটে আসিতেই সে হাসিয়া বলিল, "কি রে ভগা ! মুখ শুকো কেন ? মু'খে কে কালী ঢেলে দিয়েছে ? অসুখ ক'রেছে নাকি ?"

এ প্রশ্নের উত্তর কি দিব ? যিনি অন্তর্য্যামী, তিনিই আমার হৃদয় বুঝিতেছেন। আপন সুখসম্পদে চিরজলাঞ্জলি দিয়া কে অপরের মর্ম্মবেদনার অংশী হইতে চাহে ? তাই মরণাহতের ন্যায় কাষ্ঠহাসি হাসিয়া আমি বলিলাম, "ক'দিন খুব খাট্‌তে হ'চ্ছে।"

সেইরূপ হাস্যের সহিত অনুকূল কহিল, "বেশ ত ! আইবুড়ো শাপ্‌টা ঘুচে যা'বে। আর আমার কাছে 'বক্‌শিস্' পেতে পারিস্।"

"যথা আজ্ঞা !"—পূর্ব্ববৎ প্রাণহীন হাসি হাসিয়া উত্তর দিলাম, "যথা আজ্ঞা। এখন ত যেতে হ'বে,—দেরি ক'রে লাভ কি ?"

"দেরি ক'র্‌লে বুঝি তোর সঙ্গে প্রমদার বে হ'বে না ?"

"কচু খাও !"—ঈষৎ ক্রোধভরে অনুকূলকে বলিলাম, "কচু খাও ! আমার সঙ্গে লাগ্‌তে এলি কেন ?" সেই সঙ্গে মনে মনে বলিলাম, এত পুণ্য কি আমার আছে যে, প্রমদা আমারই হ'বে !

"ঠিক্ ক'রে বল্ দেখি, তা'কে তোর বে করবার ইচ্ছে নেই ?"

আপন দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া আমি তৎক্ষণাৎ চট্টোপাধ্যায়-গৃহে চলিয়া আসিলাম। অনুকূল ঈষৎ হাসিয়া প্রস্থান করিল।

চট্টোপাধ্যায়-গৃহে আগমন করিয়া আমি ক্রিয়াবাড়ীর সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলাম। কোথায় ঝাড়লণ্ঠন টাঙ্গাইতে হইবে, কোথায় মণ্ডপ প্রস্তুত করাইতে হইবে, কোথায় দান সাজাইতে হইবে,—এইরূপ নানাবিধ কার্য্যে দিনটা কাটিল। মধ্যে মধ্যে নহবতের বিচিত্র ধ্বনিতে শতিপূর্ণ হইয়া সকল পরিশ্রম অপনোদিত হইতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যাসুন্দরী সমীরণ-সহচর-সমভিব্যাহারে শান্ত নীরবতার সহিত রাজরাজেশ্বরীর ন্যায় ধরাতলে আবির্ভূতা হইলেন। প্রদোষের ঈষন্মলিন ছায়া সৌধচূড়ে অবতীর্ণ হইয়া সমগ্র সংসারটাকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতে লাগিল। সেই অন্ধকার দূর করিবার জন্য গৃহে গৃহে আলোক জ্বলিল।

এমত সময় আমার কার্য্য ফুরাইল। আমি তখন সকলের অজ্ঞাতসারে বিবাহবাটী হইতে বিদায় লইলাম। স্বচক্ষে নিজের বলি দেখিবার অভিপ্রায় আদৌ ছিলনা। আর সন্ধ্যার অন্ধকারটাও হৃদয়মধ্যে প্রলয়নিবাশার ন্যায় অত্যন্ত ঘনাইয়া আসিয়াছিল !

গৃহে আসিয়া হাত-পা-মুখ ধুইয়া আমি আপন পাঠগৃহে প্রবেশ করিলাম। দ্বারে খিল্ দিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া তাহাতে

উপবেশন করিয়া আমি কত কি চিন্তা করিতে লাগিলাম। বসিয়া বসিয়া ভাবিলাম, আমার কি দগ্ধ অদৃষ্ট! তড়াগের সেই অগাধ সলিলে সেইদিন কেন আমার নিশ্বাসের অন্ত হইল না! এই জীয়ন্তে মৃত্যুর অপেক্ষা কি একেবারে মরা ভাল নয়? প্রকৃত মরণে ভোগ নাই,—এ যে মৃত্যুরও অধিক! এখন ত কেবল কাল-ভুজঙ্গবিষে দেহ জরজর হইয়া ক্রমশঃ লয়প্রাপ্ত হইবে! ইহাপেক্ষা চিতাগ্নি কি সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ নয়?

তবে একটা সুখ,—প্রমদা এ বিবাহে সর্ব্বাঙ্গে সুখী। দুর্ব্বহ যাতনায় আমি চিরদিন কাঁদি, তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখ নাই, কিন্তু প্রমদা যে চিরদিন আনন্দে হাস্য করিবে, ইহাই আমার বিষাদে সুখ। যাহাকে প্রাণাপেক্ষাও অধিক জ্ঞান করি, সে যে মহাপুণ্য-বতীর ন্যায় মহাস্বপ্নে মগ্ন হইয়া থাকিবে, এতদপেক্ষা অমঙ্গলে মঙ্গলের বিষয় আর কি হইতে পারে?

কিন্তু একটা ভয়,—অনুকূল যদি বন্ধুর সর্ব্বকাহিনী শুনিয়া প্রমদাকে লইয়া অসুখী হয়? সে কণ্টক-উৎপাটনের উপায় কি? আমার জন্য কি দুইটী প্রভাতপ্রতিভাপূর্ণ পবিত্র জীবন চিরজন্মের মতন দুর্ভাগ্যের নরকান্ধকারে অবস্থান করিবে?

বিশেষ ভাবিয়া স্থির করিলাম, কলিকাতা ত্যাগ করিব। জন-হীন প্রান্তরে বা শ্বাপদসমাকুল ভীষণ অরণ্যানীতে চিরদিনের জন্য জীবনযাপন করিব। প্রমদা ও অনুকূল যাহাতে সুখী হয়, সর্ব্বস্ব পণ করিয়াও তাহা সুসম্পন্ন করিব। পুষ্পকাননে কণ্টকময় লতা-গুল্মের আবির্ভাব হইলে লোকে সেইগুলিরই উচ্ছেদসাধন করে,—প্রকৃতির গর্ব্বভূত পাদপনিচয়ের কোন অনিষ্টই সাধিত হয়না। তবে কেন প্রমদা ও অনুকূলের সুখপথে কণ্টক হইয়া থাকিব?

কতক্ষণ যে এইরূপ চিন্তা করিলাম, বলিতে পারি না, কিন্তু ঘড়ীতে সার্দ্ধ নয় ঘটিকা বাজিতেই কে আমার গৃহ-দ্বারে সঘন করাঘাত করিল। আমি স্বপ্নদৃষ্টের ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া ত্বরিতে অর্গল খুলিয়া দিলাম। দ্বারোন্মোচনপূর্ব্বক বিস্ময়ে চাহিয়া দেখি, প্রমদার পিতৃদেব,—দু'নয়নে শ্রাবণপ্রবাহিনীর ন্যায় বারিধারা।

সম্মুখে আমায় দেখিয়াই চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পঞ্চবর্ষীয় বালকের ন্যায় আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া আমার সর্ব্বশরীর ভূকম্পনে গৃহচূড়াবৎ কাঁপিয়া উঠিল। কেবল মনে হইতে লাগিল, প্রমদা কি আত্মহত্যা করিয়াছে?

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় আমি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। আমার অধর দিয়া বচনমাত্রও উচ্চারিত হইল না। কেবল মস্তকের ভিতর চাকা'র ন্যায় কি একটা বন্ বন্ করিয়া অনবরত ঘূরিতে লাগিল। আর দাঁড়াইতে না পারিয়া আমি প্রস্তরখণ্ডবৎ তথায় বসিয়া পড়িলাম। সেই সঙ্গে সর্ব্বশরীরে দরদর ধারায় ঘাম ছুটিতে লাগিল।

তখন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "আর ব'স না বাবা! ওঠ! আমার জাত-কুল-মান সব যায়। তুমি আমার মেয়ের প্রাণ দিয়েছ,—আজ আমায় রক্ষা কর।"

বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিয়া আমি বলিলাম, "কেন অনুকূল?"

"সে এই চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়ে কোথায় চ'লে গেছে।"—এই বলিয়া প্রমদার পিতৃদেব আমার হস্তে একখণ্ড কাগজ অর্পণ করিলেন। তাহা লইয়া পড়িয়া দেখি,—লেখা রহিয়াছে,—

"আমি আপনার সন্তানতুল্য। তনয়ের অনুরোধ, ভগবানের হস্তে প্রমদাকে সমর্পণ করিবেন। তাহাতে দুইজনই সুখী হইবে।"

ধন্য অনুকুল! তোমার নিঃস্বার্থ প্রেম শিক্ষা করিতে এখনও আমার বহু বিলম্ব।

আমার আর বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। গাত্রহরিদ্রা-দিনের এবং অন্যকার সকল কথাই আমার মনে পড়িল। কিন্তু অনুকূল আমার ভালবাসার কথা জানিল কি প্রকারে?

দুই-চারি মুহূর্ত্ত পরে আমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার বাটীতে আগমন করিলাম। যথাসময়ে শুভলগ্নে প্রমদার সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল। বাসরে যাইবার জন্য প্রমদা ও আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম। এমত সময়ে একজন অপরিচিত ব্যক্তি দুইটা বাক্স লইয়া আমাদের সম্মুখে আসিল। ঈষৎ হাসিয়া আগন্তুক আমার হস্তে একখানি পত্র দিল। পত্র খুলিয়া দেখি, তাহা অনুকূলচন্দ্রের। আমি উৎকণ্ঠার সহিত পড়িলাম,—

"ভাই,

যে দিন প্রমদার মুখে শুনিলাম যে, আমার সহিত বিবাহ হইলে সে বা আমি কেহই সুখী হইব না, এবং প্রমদা ও তুমি পরস্পর পরস্পরের প্রণয়পাশে বদ্ধ, সেইদিন হইতেই আমি তোমাদের মিলনের উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলাম। অনায়াসে স্বকার্য্য সিদ্ধ হইবে না বুঝিয়া আমি এই বক্র পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমি এইরূপ না করিলে তোমাদের শুভসম্মিলন এক প্রকার অসম্ভব হইত।

বাল্যকাল হইতেই তুমি আমায় ভালবাস। তাহার উপর সেইদিন আমার প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত আপন জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলে। সুতরাং আমি তোমার নিকট অশেষ ঋণে ঋণী। ইহজন্মে তোমার ঋণ শোধ হইবার নহে,—পরজন্মেও শুধিতে

পারিব কিনা সন্দেহ। আর তুমি যাহাতে অসুখী হও, তাহা আমি প্রাণ গেলেও করিব না। প্রমদাকে যে তুমি ভালবাস, তাহা আমি তোমার মুখভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

তোমাদিগকে আমার ক্ষুদ্র উপহার দিবার জন্য এই লোক মার্ফৎ দুইটা ছোট বাক্স পাঠাইলাম। আশা করি, দরিদ্র সহপাঠীর সামান্য উপহারে উপেক্ষা করিবে না। পক্ষ পরে তোমার বাটীতে গিয়া তোমাদের "যুগল-মিলন" নিরীক্ষণ করিব।

ভগবানের নিকট তোমাদের চিরমঙ্গল কামনা করিয়া বিদায় লইলাম। ইতি,

তোমাদের চিরশুভাভিলাষী

অনুকূল।"

লিপি পাঠ করিয়া আগন্তুকের হস্ত হইতে বাক্সদুইটী গ্রহণ করিলাম। উভয়ের ডালা খুলিয়া দেখি, দুই ছড়া বহুমূল্য সোণার চেন। আমি তন্মধ্যে এক ছড়া সহাস্যে প্রমদাকে পরাইয়া দিলাম। বলিলাম, "ইহা দেবতার নির্ম্মাল্য,—চিরদিন বক্ষে রক্ষা করিও।" প্রমদা অনুকূলচন্দ্রকে উদ্দেশে প্রণাম করিল।

আগন্তুক অপর ছড়া চেন্ আমার হস্ত হইতে লইয়া আমায় পরাইয়া দিল। সেই সময় আপনাপনিই আমার শিরদেশ অনুকূলচন্দ্রের স্নেহসমক্ষে কেমন নমিত হইল। আমরা তখন উভয়ে সমকণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, "এই সখ্যতার পবিত্র বন্ধন কি কখনও ছিন্ন হইবে?"

তৃতীয় ।

সরস্বতী ।

সমস্যা।

[১]

দেশে বড় হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মুখে এককথা,—কাশী হইতে কে একজন সন্ন্যাসিনী আসিয়াছেন। সন্ন্যাসিনী সাতিশয় সুন্দরী,—ভরা নদীর ন্যায় রূপ উছলিয়া পড়িতেছে।

প্রথম প্রথম গ্রামের অকর্ম্মণ্য স্ত্রী-পুরুষেরা সন্ন্যাসিনীর ভগ্নাবাসে গিয়া দলে দলে ভিড় করিতে লাগিল। চতুঃপার্শ্বে এইরূপ জনতা দেখিয়া সন্ন্যাসিনী বিস্মিতচিত্তে তাহাদিগের আগমন-প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা তখন সমকণ্ঠে তাহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। শুনিয়া সন্ন্যাসিনী স্মিতমুখে কহিলেন, "আমি ত গণনা করিতে জানিনা।"

তখন আগন্তুকেরা আপনাপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। তাহারা যে পথমধ্যে সন্ন্যাসিনী-চরিত্রের সমালোচনা না করিল, এমত কথা বলিতে পারি না। তখন যাহার যাহা মনে আসিল, সে তাহাই বলিল,—কিন্তু সে সকল কথায় আমাদের প্রয়োজন কি?

[২]

সেইদিন গভীর রজনীতে ভগ্নাবাসসম্মুখস্থিত আম্রকাননে সন্ন্যাসিনী একাকিনী তরুমূলে উপবেশন করিয়া বীণা লইয়া গান গাহিতেছিলেন। নিস্তব্ধা প্রকৃতির শান্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত সে সঙ্গীতধ্বনি মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় উঠিয়া নামিয়া কাননে ত্রিদিবমাধুর্য্যের ধারা বর্ষণ করিতেছিল। ধীর নৈশসমীরণ তাহা সযত্নে বহন করিয়া দূরে প্রতিধ্বনি-হৃদয়ে সহাস্যে ঢালিয়া দিতেছিল,—সহস্র উচ্ছ্বাসে প্রতিধ্বনি আবার গ্রামমধ্যে তাহা বিক্ষিপ্ত করিতেছিল।

এই সময়ে সঙ্গীতধ্বনি লক্ষ্য করিয়া একজন যুবক তস্করের ন্যায় নিঃশব্দ গতিতে সন্ন্যাসিনীর পশ্চাদ্দেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার বদনমণ্ডলে চিন্তার কৃষ্ণচ্ছায়া শারদান্তরীক্ষ-শোভিত জলদখণ্ডের ন্যায় ভাসমান,—সৌন্দর্য্যলাবণ্য ঈষৎ মলিন,—মধ্যাহ্ন-রবিকর-পীড়িত কুসুমের মত নৈরাশ্যসংযুক্ত। যুবকের বয়স প্রায় দ্বাবিংশতি বর্ষ।

কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ন্যাসিনী পশ্চাদ্দেশে দৃষ্টি করিলেন। তথায় যুবককে দণ্ডায়মান দেখিয়া তিনি সত্বর দাঁড়াইয়া উঠিলেন। প্রশান্ত সাগরের ন্যায় গম্ভীরদৃষ্টিতে কহিলেন, "তুমি আবার এখানে এসেছ কেন?"

কাতর নয়নে সন্ন্যাসিনীর মুখপানে চাহিয়া যুবক বলিলেন, "এততেও কি তোমার হৃদয় গ'ল্‌ল না?"

অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "অনেক দিন ত সে কথা হ'য়ে গেছে? তা'র জন্য আজ আবার বিরক্ত ক'র্‌তে এলে কেন?"

তখন জানু পাতিয়া যুবক কহিলেন, "আমায় ক্ষমা কর; পাষাণীর মত আর আমায় পরিত্যাগ ক'রো না!"

"আমি ত তোমায় পরিত্যাগ করিনি? তোমার জন্যই ত এখানে এসেছি?"

"যদি তাই হয় তবে আমার মনস্কামনা পূর্ণ ক'র্‌ছ না কেন?"

"সে আমার পক্ষে অসম্ভব। পিতার কাছে আমি সত্যে আবদ্ধা,—প্রাণান্তেও সে সত্যের অপলাপ করিব না।"

ইহা শুনিয়া যুবক একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অস্ফুট-স্বরে তাঁহার অধর হইতে নির্গত হইল, "বিধাতা কি রমণীকে পাষাণ দিয়া নির্ম্মাণ করেন?"

[৩]

ভগ্নমনে যুবক সন্ন্যাসিনীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজ আবাসস্থলে আগমন করিলেন। তৎপরে তিনি শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে চিন্তা-সুন্দরী আপন সঙ্গিনীদলসমভিব্যাহারে তাঁহার মানস-কাননে দর্শন দিয়া রাজরাণীর ন্যায় স্বীয় প্রভাববিস্তার করিতে লাগিলেন।

যুবক ভাবিলেন, "ইহাতে আমার দোষ কি? আমি ক্ষত্রিয়,—কুলোচিত কার্য্যসম্পাদনে আমার সর্ব্বদাই রত থাকা কর্ত্তব্য। আমি তাহাই সম্পন্ন করিয়াছি। তবে আমার প্রতি দীলিয়ার এত ঘৃণা কেন?

"কেন? পিতার নিকট সে সত্যে আবদ্ধা। সাধ করিয়া তাহার এইরূপ অনর্থক সত্যপালন স্বীকার করা কেন? তাহাতে কি সে সুখী? কখনই না। তাহা হইলে ছায়ার মত দিবারাত্রি আমার অনুসরণ করিত না। তবে এই সত্যবন্ধনে তাহার কি লাভ?

"লাভ?—লাভালাভ সে আমাপেক্ষা অধিক বুঝে। আমি ইহাতে কি বলিব? তবে এইমাত্র বলিতে পারি, তাহার সত্য-রক্ষণে আমার জীবন দিন দিন তৈলহীন প্রদীপের ন্যায় মলিন হইয়া আসিতেছে,—একটা ফুৎকারের প্রয়োজন,—তাহা হইলেই সব শেষ হইয়া যায়। কিন্তু সে ফুৎকার যে কবে আসিবে, তাহা কে বলিবে?

"এখন কি করি? দূরে সরোবরের সুশীতল বারি,—নিদাঘ-রৌদ্রপীড়িত তৃষিত পথিক একাগ্রমানসে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছে,—মধ্যস্থলে অসিহস্তে ভীম প্রহরী,—একপদ অগ্রসর

হইবার উপায় নাই,—তখন তাহার কি করা উচিত? সে তাহা পরিত্যাগ করিবে, না আশায় সেইখানে বসিয়া থাকিবে?

সে যাহাই করুক, আমি কিন্তু প্রথমটী গ্রহণ করিব। তুষানলে ধিকি ধিকি জ্বলিয়া খাক্ হওয়া অপেক্ষা জ্বলন্তবহ্নিতে প্রবেশ করা ভাল,—মুহূর্ত্তে সমস্তই লয় পাইবে। আমি তাহাই করিব,—দীলিয়াকে সর্পিণী ভাবিয়া শতযোজন দূরে থাকিব,—কল্যই গ্রামত্যাগ করিব। কালে কি আমার এই জ্বালা কখনও নিবিবে না?"

[৪]

সমস্তদিন ধরিয়া মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। আকাশ ঘোরঘনঘটাচ্ছন্ন, জগৎ-হৃদয়ে তাহার ছায়া পূর্ণভাবে ফুটিয়া পড়িতেছে। শৈলগাত্রে তরঙ্গে তরঙ্গে নামিয়া বর্ষাবারি বিষমাবর্ত্তে পর্ব্বতপদতলধৌতসরিৎসঙ্গমে উল্লাসে ছুটিয়া যাইতেছে।

এই সময়ে একজন যুবতী সিক্তবসনে একটা ক্ষুদ্র তরুতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় এক শিলাসনে উপবেশন করিয়া তিনি গাত্রের আর্দ্রবস্ত্র উন্মোচনপূর্ব্বক তাহা নিঙ্গড়াইতে লাগিলেন। সেই সময়ে চিকিমিকি করিয়া চপলা বালিকার মত গগনে একবার বিদ্যুৎ হাসিয়া উঠিল।

চপলালোকে যুবতী দেখিলেন, বিংশতি হস্ত দূরে কে যেন একজন পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে তাহার নিকটে আগমন করিলেন। পুনঃস্ফুরিত বিদ্যুৎপ্রভায় দেখিলেন, পতিত ব্যক্তি একজন পুরুষ,—বোধ হয় মৃত। জীবিত কি মৃত স্থির করিবার জন্য তিনি তাহার গাত্রস্পর্শ করিলেন। অনুভবে বুঝিলেন, তাহা তুষারের ন্যায় শীতল। তখন তিনি তাহার নাসিকাগ্রে হস্ত দিয়া রুদ্ধনিশ্বাসে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, নিশ্বাস অতি ক্ষীণভাবে বহিতেছে।

মুহূর্ত্তমধ্যে কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া যুবতী আপন কটিদেশে বস্ত্র বন্ধন করিলেন। তৎপরে দুই করে তাহাকে উত্তোলন করিয়া

আপনার পৃষ্ঠদেশে বহন করিলেন। অতি সন্তর্পণে তখন তিনি পথাতিক্রম্ করিতে করিতে স্বীয় আশ্রমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কতবার পদস্খলন হইল,—কোমলচরণতলে কত প্রস্তরকুচি ফুটিল,—দুর্ব্বহভারে পৃষ্ঠদেশ ভগ্ন হইবার উপক্রম হইল,—তাঁহার কোন দিকেই দৃষ্টি নাই,—তিনি কেবল একমনে পথাতিক্রম করিতে লাগিলেন।

[৫]

একবিংশতি দিবসে যুবকের জ্ঞান সঞ্চার হইল। তিনি অতি ধীরে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "আমি কোথায় ?" কিন্তু কেহই তাহার কোন উত্তর দিলনা। তখন তিনি ধীরে ধীরে নয়নোন্মীলন করিয়া একবার উন্মুক্তবাতায়ন পানে দৃষ্টি করিলেন। তথায় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তিনি পুনর্ব্বার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার প্রশস্ত ললাটে শিশিরের ন্যায় স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিল।

যুবকের শিয়রে একজন অসামান্যা রূপলাবণ্যময়ী যুবতী। তাঁহার প্রশান্ত বদনমণ্ডলে ঊষার পবিত্র কোমল ছায়া শান্তপ্রকৃতির ন্যায় হাস্য করিতেছিল। যুবকের ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু দেখিয়া তিনি তালবৃন্ত লইয়া সযত্নে বীজন করিতে লাগিলেন।

দুই চারি মুহূর্ত্ত পরে যুবক মুদ্রিত নয়নে পুনর্ব্বার কহিলেন, "তুমি কে ? দেবী না মানবী ?"

প্রশ্নের কেহ উত্তর দিলনা। তখন যুবক পুনর্ব্বার চক্ষু খুলিয়া শিয়রে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, যে বসিয়াছিল, সে আননে বসন টানিয়া উঠিয়া গেল। কাতর-কণ্ঠে যুবক বলিলেন, "তুমি যে হও, আমার সঙ্গে ছলনা ক'রো না! দয়া ক'রে তোমার পরিচয় আমায় দিয়ে যাও।"

যুবতী তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না,—পূর্ব্ববৎ ধীরপাদবিক্ষেপে কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। তখন একটী, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যুবক আপন মনে কহিলেন, "দেবীরাও কি পাষাণে গঠিত ?"

[৬]

ক্ষুদ্র দেবমন্দির। মন্দিরমধ্যে শিবলিঙ্গের প্রতিমূর্ত্তি,—সম্মুখে কুশাসনোপবিষ্টা ধ্যানস্তিমিতলোচনা গৈরিকবসনা রুদ্রাক্ষ-ধারিণী রমণী। তাঁহার বিভূতিচন্দনাচ্ছাদিত বদনমণ্ডল হইতে লুপ্তসৌন্দর্য্যের যে জ্যোতির্ম্ময়ী ছায়া ফুটিয়া পড়িতেছিল, তাহা তখন যে দেখিত, সে-ই বলিত, এ রমণী বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি,—সৌন্দর্য্যের স্বর্গীয় প্রতিমূর্ত্তি।

ধ্যানসমাপনান্তে রমণী ভক্তিভরে দেবতাচরণে প্রণতা হই-লেন। কহিলেন, "দেবাদিদেব মহাদেব! দাসীর হৃদয়ে বল দিও। দেখিও,—প্রলোভনে পড়িয়া যেন পথভ্রষ্টা না হই। দুর্ব্বলের সহায় তুমি,—এ অভাগিনীর মিনতি,—চরণে স্থান দিও।"

সেই সময়ে একজন যুবক মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় রমণীকে দেখিয়া বিস্ময়ে তিনি চমকিয়া উঠিলেন। কহি-লেন, "দীলিয়া! তুমি এখানে যে?"

মৃদুস্বরে দীলিয়া বলিলেন, "কেন? আমি ত তোমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকি?"

একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যুবক পুনর্ব্বার বলিলেন, "জানি দীলিয়া! তবুও তোমার ক্ষমা পেলেম না!"

"কি ক'রব বিজয়! এতে আমার কোন হাত নেই। বিধা-তার ইচ্ছা কে খণ্ডাবে বল?"

বিজয়সিংহ তখন দীলিয়ার পদতলে পতিত হইলেন। অতীব কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "দীলিয়া! আমায় রক্ষা কর। সেদিন ঘোরদুর্য্যোগে আমায় জীবন দিয়েছ,—এখন আর মের' না,—আমার অপরাধ ক্ষমা কর,—একবার মুখপানে ফিরে চাও।"

দীলিয়া বিজয়সিংহকে করে ধরিয়া তুলিলেন। সাশ্রুনয়নে কহিলেন, "বিজয়! আমায় ক্ষমা কর। আমায় সত্যনাশের পাতকিনী ক'রোনা। বিধাতার অভিশাপে এ জন্মে তোমায়-আমায় মিলন অসম্ভব।"

"আমি তোমার এমন কি ক্ষতি ক'রেছি যে, তুমি আমার সকল সুখে বাদ সাধ্‌ছ ?"

ললাট কুঞ্চিত করিয়া অপ্রসন্নদৃষ্টিতে দীলিয়া ক্ষীণহাসি হাসিয়া বলিলেন, "কি ক'রেছ ? ভেবে দেখ, তুমি আমার কি ক'রেছ ! তুমি আমার যা' না করবার তা'ই ক'রেছ ! তোমার জন্যই আমার এই কঠিন পণ,—স্বয়ং মহাদেব এলেও আমায় টলা'তে পার্‌বেন না। আমি এখন নিজের কাজে যাচ্ছি,—আমার পিছু নিওনা।"

এই বলিয়া দীলিয়া প্রস্থান করিলেন

[৭]

"আর কেন ? জীবনযজ্ঞের এইখানেই সমাপন করা যা'ক্।"

—দীলিয়া প্রস্থান করিলে পর বিজয়সিংহ আপন মনে এই কথাগুলি বলিলেন। তৎপরে তিনি মূর্ত্তিপদতলে বসিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। এতদিনে তাঁহার সকল আশা-ভরসা জন্মের মত ফুরাইল।

দণ্ড দুই পরে বিজয়সিংহ উঠিলেন। তাঁহার প্রশান্ত বদন-মণ্ডলে স্থির প্রতিজ্ঞার একটা কঠিন ছায়া জলদখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া উঠিল। শিবলিঙ্গের প্রতি অনিমেষনেত্রে দৃষ্টি করিয়া তিনি মহা-মহীরুহের ন্যায় অচল অটল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সহসা বিজয়সিংহের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। উন্মত্তের মত তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মহাদেব কে বলে তোমার হৃদয় কোমল ? তুমি ওই প্রস্তরমূর্ত্তির মতই নির্ম্মম,—পাষাণে তরলতা কে কবে দেখিয়াছে ? লোকে তোমার পূজা করে কেন ?"

বিজয়সিংহ দ্রুতপদে শিবমন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেই সময়ে দূরে কে গাহিয়া উঠিল,—

"আপন করম-বশে সুখ-দুঃখ ভুঞ্জে নর।
তবে কেন মিছা দোষে অপরে গো দোষী কর ?"

[৮]

ইহার পর দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।

নিদাঘপ্রারম্ভে একদিন প্রদোষকালে শীতল বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া দুইজন কথোপকথন করিতেছিল। প্রায় বিংশতি হস্ত দূরে একটা ঝোপের পশ্চাতে বসিয়া কে একজন তুষারধবল বস্ত্রে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া তাহাদের সেই কথোপকথন একমনে শুনিতেছিল। সন্ধ্যার মলিন ছায়ারাশি তখন তাল পাকাইয়া সর্ব্বত্র ভীতির সঞ্চার করিতেছিল।

উপবেষ্টা দুইজনের মধ্যে একজন অপরকে কহিতেছিল, "তা ভাই! কাজটা যদি গুছুতে পারি তবে ত কেল্লা মার্ দিয়া। দশ হাজার আশ্রফী পেলে ডাকাতী ছেড়ে দেব।"

ঈষৎ হাসিয়া অপর ব্যক্তি কহিল, "তা' ত বুঝ্লুম। এখন কাজ সাফ্ ক'র্তে কি পার্বি?"

"কেন পা'র্ব না? এতদিন ডাকাতী কর্লুম কি ক'র্তে?"

"আরে, সে বড় শক্ত ঠাঁই। তা'র উপরে ভৈরবীর দৃষ্টি আছে।"

"থাকে থাকুক্,—তা'তে আমার কি? আমি তা'র কাটামুণ্ড নিয়ে বাদ্শাহকে ভেট দেব; তা' হ'লেই দশ হাজার আশ্রফী আমার হাতে চক্‌চক্ ক'র্বে।"

"তবে চল্। এখানে ব'সে থেকে আর কি হ'বে?"

দুইজন গাত্রোত্থান করিয়া উদ্দিষ্ট দেশাভিমুখে অগ্রসর হইল।

[৯]

যখন তাহারা তরুতল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তখন গুল্ম-পার্শ্বস্থ উপবেষ্টা আবরণ খুলিয়া ফেলিলেন। মুক্তাবরণ হইলে তাঁহার প্রকৃতমূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। তিনি একজন রমণী।

রমণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই নবোদিত পূর্ণচন্দ্রশোভিত নক্ষত্রখচিত সুনীল গগনতলে দাঁড়াইয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। পরে দ্রুতপদে নিকটবর্ত্তী কুটিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং কুটীর হইতে ক্ষিপ্রহস্তে একটা ত্রিশূল লইয়া পুনরায় নিষ্ক্রান্তা হইলেন। তৎপরে মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথা অদৃশ্যা হইয়া গেলেন। তখন চন্দ্রমার ম্লানজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। জগৎ হাসিল।

[১০]

তর্‌-তর্‌ ঝর্‌-ঝর্‌ করিয়া উপলখণ্ড চুমিতে চুমিতে স্রোতস্বিনী নদীসঙ্গমে ছুটিতেছে। হৃদয়ে তাহার পূর্ণবাসনা,—কুলুকুলু রবে তাহা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। স্রোতস্বতীর এই রমণী-বিগর্হিত চঞ্চলতা দেখিয়া শশধর ঈষৎ অপ্রসন্ন। পূর্ণযৌবনা তরঙ্গিনী প্রকৃতি-পালিতা চঞ্চলা কিশোরীর ন্যায়, সময়ের অনন্ত স্বাধীনক্রীড়ার ন্যায়, অশীতিপর বৃদ্ধের তৃতীয় পক্ষের তরুণী গৃহিণীর ন্যায়, তাঁহার সে অপ্রসন্নতাকে প্রতিক্ষণে উপেক্ষা করিতেছে। ক্বচিৎ দুই একটা চাতক মধুরে ঝঙ্কার দিতেছে।

এমত সময়ে এই নদীসৈকতে বসিয়া একজন যুবক একাকী বিরাজ করিতেছিলেন। তাঁহার অনিমেষনয়নযুগল স্রোতস্বতীর উপর ন্যস্ত ছিল। এই নির্জ্জন প্রদেশে বসিয়া তিনি প্রকৃতির নৈশ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছিলেন।

প্রায় একদণ্ড পরে যুবক গাত্রোত্থান করিয়া বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া আপন মনে বলিলেন, "এই নির্ম্মল তরঙ্গিনী দুই দিন পরে হিন্দু-যবনের রুধির-ধারায় রঞ্জিত হইবে। আজ যাহা আনন্দময়, কল্য তাহা ভীষণ ভীতিপূর্ণ!—কি পরিবর্ত্তন!

"জগতে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন, নহিলে প্রকৃতির সামঞ্জস্য থাকে না। একই ভাবে, একই সৌন্দর্য্যে, একই প্রাণে যদি সংসারের গতি প্রতিনিয়ত পরিচালিত হয় তাহা হইলে জীবনের তৃষ্ণা শীঘ্রই ফুরাইয়া যায়,—উদ্যমহীনতা প্রশ্রয় পায়,—প্রকৃত জীবন চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হয়। এই প্রাণহীণতার বিনাশ হেতু জগতে পরিবর্ত্তনের সৃষ্টি—পুরাতন যায়, নূতন আসে।

"যায় যা'ক্‌, আসে আসুক,—আমার তাহাতে কি? আমি রাজপুত,—ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্যসাধনে আমার যত্নবান হওয়া উচিত। উচিত বলিয়াই আজ যবনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি। কিন্তু যাহার আশায় এইখানে ঘুরিতেছি তাহার কি একবার দর্শন পাইব না? সে কি—"

"সাবধান! সাবধান!! তোমায় খুন ক'রতে যাচ্ছে!"—ঠিক এই সময়ে কোমল কণ্ঠে কে ঐ কথা বলিয়া উঠিল। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া যুবক পশ্চাতে মুখ ফিরাইলেন। দেখিলেন, উন্মুক্ততরবারিহস্তে দুইজন ভীমকায় দস্যু অদূরে তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আবার দেখিলেন, ভৈরবীবেশিনী একজন রমণী তাহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া মহামায়ার ন্যায় এক-জনের বক্ষঃস্থলে সবলে ত্রিশূল বসাইয়া দিলেন। বিকট চীৎকারে দস্যু প্রকাণ্ড পাদপের ন্যায় ধরাতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। চক্ষের পলক ফেলিয়া যুবা আবার দেখিলেন, অপর দস্যু তৎক্ষণাৎ ভৈরবীর হৃদয়ে স্বহস্তস্থ তরবারি বসাইয়া দিল,—ভৈরবী পড়িয়া গেলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে যুবা আপন অসি নিষ্কাশিত করিয়া দস্যুর দিকে অগ্রসর হইলেন,—প্রাণভয়ে সে পলায়ন করিল।

যুবক তখন ভৈরবীর নিকট আগমন করিলেন। দেখিলেন, ভৈরবী আর কেহ নহে,—দীলিয়া।

অতি ম্লান হাসি হাসিয়া দীলিয়া বলিলেন, "বিজয়! এসেছ? আমার পাশে একবার ব'স। আমায় ক্ষমা কর। তোমার হৃদয়ে জেনেশুনে কত ব্যথা দিয়েছি,—এখন সে সব ভুলে যাও। এ অন্তিমকালে ছেলেবেলার মত আদর ক'রে আবার একবা. 'দীলিয়া' ব'লে ডাক। তোমার হাত আমার বুকের উপর দাও।"

হৃদয়ের পূর্ণাবেগে বিজয়সিংহ কহিলেন, "দীলিয়া! দীলিয়া! আমায় ফেলে কোথায় যাও?"

নিবিবার আগে প্রদীপ একবার হাসিয়া উঠিল। দীলিয়া পুন-র্ব্বার বলিলেন, "বিজয়! আমার সময় ফুরিয়ে আস্ছে। তোমার চরণধূলি মাথায় দাও। তুমি আমার দেবতা, আশীর্ব্বাদ কর, জন্মা-ন্তরে তোমাকেই যেন স্বামী পাই। হৃদয়ে যেন এ রকম আর নর-কের আগুন না জ্বলে। ঘোর তৃষ্ণায় ম'রছি পরজন্মে যেন শান্তি পাই। তুমি আমার দোষ—ক্ষমা—কর—বি—জ—য়—"

সব ফুরাইল!